
আজব দেশে
অ্যালিসের
অ্যাডভেঞ্চার

আজব দেশে অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চার

অনুবাদ

জয়ন্ত চৌধুরী

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৬, ১৩৮২
জুলাই ১, ১৯৭৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
আষাঢ় ৩০, ১৩৮৯
জুলাই ১৫, ১৯৮২

এশিয়া

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর
শ্রীবাদলচন্দ্র পাল
এস্ এম্ প্রিণ্টিং
১৯ডি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

বাঁধাই
মালক্ষ্মী বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অলংকরণ
স্যার জন টেরিয়েল

প্রচ্ছদ
সুব্রত ত্রিপাঠী

মূল্য
৮·০০ টাকা

অ্যালিস নামে মেয়েটি

তিনটি বোনের মধ্যে মেজোবোন হল অ্যালিস। নৌকো চড়ে বেড়াতে বেড়াতে সত্যিকারের এই অ্যালিসকে নিয়ে গল্প ফেঁদেছিলেন লুইস ক্যারল, আর তাই হয়ে দাঁড়াল বিশ্ববিখ্যাত বই 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'। তার পরে লিখেছিলেন, 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস'। ওর পুরো নাম হল, অ্যালিস প্লেজেন্স লিডেল। ১৮৫২ সালের ৪ মে তার জন্ম। তার বাবা, ডক্টর হেনরি লিডেল তখন ছিলেন ওয়েস্টমিনিস্টার স্কুলের হেডমাস্টার; পরে অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চের ডীন হন।

অ্যালিসের কাহিনীতে বার দুয়েক তার আসল জন্মদিনের উল্লেখ আছে। 'শুয়োরছানা আর গোলমরিচ' পরিচ্ছেদের শেষে অ্যালিস বলছে ঃ

"টুপিওলা তো অনেক দেখেছি, চৈতী খরগোশটাই বেশ মজার হবে মনে হচ্ছে। আর, এটা তো মে মাস, এখনও বোশেখ চলছে, কাজেই একেবারে ক্ষ্যাপা উন্মাদ হবে না নিশ্চয়ই—অন্তত চৈত্র মাসের চেয়ে কম তো হবেই।"

আবার 'ক্ষ্যাপা-মার্কা চায়ের আসর'-এ রয়েছে ঃ

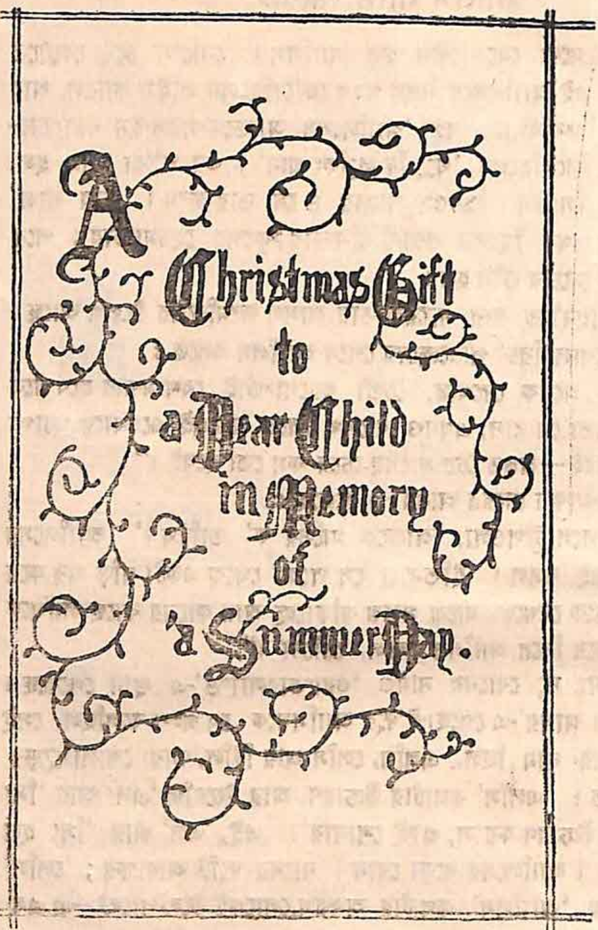
"প্রথমে কথা বললে টুপিওলা, 'আজকে মাসের ক' তারিখ?' অ্যালিসের দিকে মুখ ফিরিয়েই বলল। ইতিমধ্যে সে পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার করে বার বার ভুরু কুঁচকে দেখছে, মাঝে মাঝে ঝাঁকাচ্ছে আর কানের কাছে লাগিয়ে শুনছে। একটু ভেবে নিয়ে অ্যালিস বললে, 'চৌঠো'।"

অ্যালিসের অন্য দু বোনের নামও 'ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এ স্থান পেয়েছে। 'ক্ষ্যাপা-মার্কা চায়ের আসর'-এ গেছো-ইঁদুর অ্যালিসকে যে গল্প বলেছিল, সেই গল্পের তিন বোনের নাম ছিল, এলসি, লেসি আর টিলি, তারা ঝোলাগুড়ের কুয়োর তলায় থাকত। 'এলসি' কথাটার উচ্চারণ, আর ইংরেজি 'এল' আর 'সি' অক্ষরদুটো পর পর উচ্চারণ করলে, একই শোনায়। এই, 'এল' আর 'সি' হল লরিনা শার্লট-এর (অ্যালিসের বড়ো বোন) নামের দুটি আদ্যক্ষর; 'লেসি' কথাটার বানান হয় 'অ্যালিস' কথাটার অক্ষরগুলোকেই উল্টেপাল্টে—এ এল আই সি ই—উল্টেপাল্টে হয়েছে এল এ সি আই ই; আর 'টিলি' হল ওদের ছোটো বোন, এডিথ-এর ডাক নাম।

'থ্রু দি লুকিং গ্লাস'-এর কাহিনীতে অ্যালিসের পদবির ইঙ্গিত আছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অ্যালিস বলছে ঃ

"সত্যিই তো, আমি কে? চেষ্টা করলেই মনে পড়ে যাবে। নিশ্চয়ই মনে করব!" কিন্তু নিশ্চয়ই বললেই তো আর হয় না। অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা খুঁড়ে এইটুকুই শুধু বলতে পারলে, "'এল', ঠিক জানি আমার নামের আরম্ভটা 'এল' দিয়ে!"

১৮৮০ সালে রেজিনাল হারগ্রীভস-এর সঙ্গে অ্যালিস লিডেল-এর বিবাহ হয়; মৃত্যু হয় ১৯৩৪ সালে। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর সঙ্গে তাঁর একটা বংশগত সম্পর্ক ছিল।


A Christmas Gift to a Dear Child in Memory of a Summer Day.

অ্যালিস-কাহিনীর পাণ্ডুলিপি

মুখে মুখে গল্প শোনাবার পর, লুইস ক্যারল সেটিকে গুছিয়ে-গাছিয়ে খুব সুন্দর একটি পাণ্ডুলিপির আকারে লিখে অ্যালিস লিডেলকে বড়োদিনের উপহার দেন। বিয়ের পরেও অ্যালিস (তখন মিসেস হারগ্রীভস) সেটিকে অমূল্য সম্পদের মতো আগলে রেখেছিলেন। পরে বিশেষ কারণে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের এক সংগ্রাহকের কাছে পাণ্ডুলিপিটি বিক্রি করে দেন ; ১৫,৪০০ পাউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

Chapter I.



Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, and where is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? So she was considering in her own mind, (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid,) whether the pleasure of making a daisy-chain was worth the trouble of getting up and picking the daisies, when a white rabbit with pink eyes ran close by her.

There was nothing very remarkable in that, nor did Alice think it so *very* much out of the way to hear the rabbit say to itself "dear, dear! I shall be too late!" (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural); but when the rabbit actually *took a watch out of its waistcoat-pocket*, looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for

'অ্যালিস'-এর কাহিনীদুটি সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন দুটিরই ছবি এঁকেছিলেন সে-যুগের বিখ্যাত কার্টুন-আঁকিয়ে, স্যার জন টেনিয়েল। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিস-কাহিনীর অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে টেনিয়েলের কৃতিত্ব কম নয়। সেই মূল ছবিগুলি বর্তমান সংকলনে ব্যবহার করতে পেরে আমরা গৌরব অনুভব করছি। প্রথম খণ্ডের বাকি ছবিগুলি এঁকেছেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

খরগোশের গর্তে

নদীর পাড়ে দিদির পাশে চুপচাপ বসে থাকা, কিছু করবার নেই—অ্যালিসের বিরক্তি ধরে গেছে। দিদি বই পড়ছে। দু-একবার উঁকি মেরে দেখেছে অ্যালিস, কিন্তু তাতে না আছে ছবি, না আছে গল্পের মতো কোনো কথাবার্তা। অ্যালিস ভাবে, 'ছবি নেই, কথাবার্তা নেই, এই বইয়ের কি কোনো মানে হয়?'

অ্যালিস তখন ভাবতে বসল (অবশ্য, যতটা পরিষ্কার করে ভাবা যায়, কারণ যা গরম পড়েছে, কেমন যেন ঢুলুনি আসছে, বুদ্ধিগুলো যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে) ডেজি ফুল দিয়ে একটা বিনিসুতোর মালা গাঁথলে কেমন হয়? ওঠো রে, ফুল তোলো রে, অত হাঙ্গামা কি পোষাবে? ভাবছে, এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে গোলাপি চোখওলা একটা খরগোশ তার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয়; খরগোশটা যখন বিড় বিড় করে বললে, "হায় রে, হায়, বড্ড দেরি করে ফেললাম রে," তখনো অ্যালিসের এমন কিছু অদ্ভুত মনে হল না। (পরে যখন এই নিয়ে ভেবেছে, তখন মনে হয়েছে অবশ্য যে, অবাক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেই সময়ে সবই সবাভাবিক লেগেছে তার কাছে।) কিন্তু খরগোশটা এবার যখন তার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার করে দেখতে লাগল, তার পর

আবার হনহনিয়ে এগিয়ে গেল, তখন অ্যালিস অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। কারণ, হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে যে, এর আগে তো সে এমন খরগোশ জন্মে দেখেনি, যার ওয়েস্টকোট আছে, আবার ঘড়ি রাখবার পকেট আছে! ভীষণ আশ্চর্য হয়ে খরগোশটার দিকে ছুট্টে চলল অ্যালিস মাঠের ওপর দিয়ে, আর, কপাল-জোর বলতে হবে, কাছাকাছি পেঁছিতেই দেখতে পেল, ঝোপের নিচে একটা বড়োসড়ো গর্তের মধ্যে সাঁৎ করে সেঁধিয়ে গেল সেই খরগোশটা।

আর, ঠিক তার পরেই তার পেছন পেছন অ্যালিসও নেমে পড়ল সেই



গর্তের মধ্যে, একবার ভাবলেও না যে, গর্ত থেকে আবার ওপরে উঠবে ছাই কী করে।

খরগোশের বাসার গর্তটা সুড়ঙ্গের মতো খানিকটা সোজাসুজি যাবার পর একেবারে না বলে-কয়ে কুয়োর মতো খাড়া নেমে গেছে নিচের দিকে; এমনি আচম্‌কা নিচে নেমেছে যে, থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়বে কি-না, সেটা ভাববার সময়টুকুও পেল না অ্যালিস বেচারি, তার আগেই টের পেল একটা গভীর কুয়োর মধ্য দিয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে সে।

কুয়োটা বোধ হয় ভয়ানক গভীর, কিম্বা হয়তো অ্যালিসই পড়ছে

খুব আস্তে আস্তে, কারণ, পড়তে পড়তে অ্যালিস বেশ করে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার সময় পেল, এর পর কী-না-কী হবে, তাই নিয়ে ভাববারও সময় পেল। প্রথমে নিচে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে কোথায় যাচ্ছে ; কিন্তু বড্ডো অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। তার পর, কুয়োর দেওয়ালের দিকে তাকালে ; দেখলে, সেখানে সারি-সারি সব দেরাজ আর বইয়ের তাক। কোথাও কোথাও আবার ম্যাপ আর ছবি টাঙানো রয়েছে। পড়তে পড়তেই অ্যালিস হাতের নাগাল পেয়ে তাক থেকে একটা বয়াম তুলে নিলে ; তার গায়ে লেখা আছে 'কমলা লেবুর মোরব্বা'। কিন্তু, বরাত খারাপ, বয়ামটা খালি। পাছে কারো ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, তাই বয়ামটা ফেলে না দিয়ে হাতের কাছে একটা তাকের নাগাল পেয়ে তাতেই বসিয়ে দিলে।

অ্যালিসের মনে হল, 'যাক্ বাবা, যেরকম পড়া পড়ছি, সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবার ভাবনা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার কোনো মানেই হয় না। আঃ, বাড়ির সবাই ভাববে, আমার কতো সাহস ! বাড়ির একদম সবচেয়ে উঁচু থেকে নিচে পড়ে গেলেও টুঁ শব্দটি বেরবে না মুখ থেকে, হ্যাঁ !' (কথাটা বোধ হয় ঠিকই।)

পড়ছে তো পড়ছেই। নামছে তো নামছেই। পড়ার কি শেষ নেই ? অ্যালিস এবার জোরে জোরেই বলে ফেললে, "এতক্ষণে কত মাইল যে পড়লুম, কে জানে বাবা ! পৃথিবীর ভেতরকার মাঝ-মধ্যিখানের কাছাকাছি কোথাও এসে গেছি মনে হচ্ছে। দাঁড়াও, একবার হিসেব করে নিই : পৃথিবীর মাঝ-মধ্যিখানটা হল, যদ্দূর মনে হচ্ছে, চার হাজার মাইল নিচে..." (ব্যাপার হল, ইস্কুলে এই ধরনের অনেক সব ব্যাপার শিখেছে সে ; যেখানে শোনবার কেউই নেই, সেখানে বিদ্যে জাহির করার কোনো মানেই অবশ্য হয় না, তবু জানা কথাগুলো বার বার আওড়ালে অভ্যেসটা তো অন্তত থাকে !) "...হ্যাঁ, মোটামুটি হাজার চারেক মাইলই বটে—তবে একটা কথা, কতো অক্ষাংশ আর কতো দ্রাঘিমাতে পেঁছিচ্ছি, সেটাই তো ঠিক মাথায় আসছে না।" (অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমা ব্যাপারটা অ্যালিসের মোটেই কিস্যু জানা নেই, তবে, ওর মনে হয়েছে কথাগুলো বললে বেড়ে গালভরা শোনায়।)

অ্যালিস আবার কপ্‌চাতে শুরু করলে, "ভাবছি, পৃথিবী ফুঁড়ে বেরিয়ে

ওদিকে গিয়ে পড়ব না তো ? এমন এক জায়গায় গিয়ে হয়তো বার হলাম, যেখানে লোকেরা নিচের দিকে মাথা করে হাঁটে—কী মজার কাণ্ড ! কী যেন বলে—'প্রতিকূল' বোধ হয়···" (শোনবার কেউ নেই বলেই বাঁচোয়া, কারণ কথাটা মোটেই ঠিক শোনাল না ।)

"....যাই হোক, জায়গার নামটা তো জিগেস করেই জেনে নিতে হবে, তাই না ? কি মনে করবেন না, ঠাকরুন, এটা কি নিউজীল্যাণ্ড, না অস্ট্রেলিয়া ?" (কথা বলবার সময়ে সহবৎ দেখাবার জন্যে অ্যালিস আবার মাথাটা ঝোঁকালে নিচের দিকে—হুস্ হুস্ করে নিচে পড়তে পড়তে আবার সহবৎ দেখান, কাণ্ডখানা ভাব একবার । তোমরা হলে পারতে ?) "তখন তিনি কী মখ্যু মেয়েই না ভাববেন আমায় ! না বাবা, জিগেস-টিগেস করার ধার দিয়েও যাচ্ছি না ; কোথাও লেখা-টেখা থাকবে, দেখে নেব ।"

পড়ছে তো পড়ছেই, নামছে তো নামছেই । কিছুই তো আর করবার নেই, তাই অ্যালিস আবার বকর বকর শুরু করলে, "মনে হচ্ছে, ডাইনা বেচারার মন কেমন করবে আমার জন্যে রাত্তির বেলা । (ডাইনা হল অ্যালিসের বেড়ালটা ।) চা খাবার সময়ে ওরা ডাইনার দুধের বাটিটার কথা না ভুললে বাঁচি । ডাইনা রে, এখন তুই এখানে আমার কাছে থাকলে কী মজাই হত রে ! দুঃখের কথা, এখানে তো ইঁদুর-টিঁদুর মোটেই নেই, তবে বাদুড় ধরতে পারিস ; বাদুড়রা প্রায় ইঁদুরেরই মতো, জানিস তো । কিন্তু বেড়ালে কি বাদুড় খায়, কে জানে বাবা !" বলতে বলতে অ্যালিসের ঢুল এসে গেল, ঘুম-জড়ানো সুরে বিড় বিড় করে আপন মনে বলে চলল, "বেড়ালে কি বাদুড় খায় ? বেড়ালে কি বাদুড় খায় ?" মাঝে মাঝে আবার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, "বাদুড়ে কি বেড়াল খায় ?" আসল কথা হল কোনোটারই উত্তর যখন জানা নেই, তখন যেভাবেই বলা হোক-না-কেন, কীই-বা আসে যায় ।

অ্যালিস এবার টের পেয়েছে যে, বেশ একটু তন্দ্রা এসেছিল তার, স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল যে, ডাইনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে "বেড়াতে বেড়াতে বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকে জিগেস করছে, 'ডাইনা, একটা সত্যি কথা বল্ তো, কখনো বাদুড় খেয়েছিস ?" আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ— ধুপুস্ । এক গাদা শুকনো পাতার ওপর এসে পড়ল অ্যালিস, নিচে নামার শেষ হল !

লাগেনি মোটেই, টক্ করে সে উঠে দাঁড়াল। ওপর দিকে তাকালে, শুধু অন্ধকার। সামনের দিকে আবার একটা লম্বা পথ।

সেই খরগোশভায়াকে দেখা গেল সেই পথ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে যাচ্ছে। তখন আর এক মুহূর্তও নষ্ট করার সময় নেই, ঝড়ের মতো অ্যালিস এগিয়ে গেল, আর শুনতে পেলে, একটা বাঁকের মুখে ঢুকতে ঢুকতে খরগোশটা বলছে, "হায় রে কান, হায় রে গোঁফ, কী দেরিই না হয়ে গেল!" মোড়টা যখন ঘুরছে, অ্যালিস তখন খরগোশটার কাছ থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না, কিন্তু মোড় ফেরার পরই তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। একা অ্যালিস দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, নিচু একটা হল্‌ঘরের মধ্যে, ছাদ থেকে ঝোলানো সারি সারি আলোয় ঘরটা ঝক্‌মক করছে।

ঘরটার চারিদিকেই দরজা, কিন্তু সব কটাই চাবি দেওয়া। ঘরের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত ঘুরে যখন দেখা গেল একটা দরজাও খোলা গেল না, তখন মনের দুঃখে ঘরের মাঝ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে অ্যালিস ভাবতে লাগল, কোনোদিন কি আবার বেরোতে পারবে সে এখান থেকে, কী করেই-বা বেরোবে?

হঠাৎ সে এসে পড়ল একটা ছোট্টো তে-পায়া টেবিলের কাছে, তার সবটা কাঁচের তৈরি। টেবিলে কিচ্ছু নেই, শুধু একরত্তি একটি সোনালী চাবি। দেখে প্রথমেই অ্যালিসের মনে হল, নিশ্চয়ই একটা-না-একটা দরজার চাবি হবে। কিন্তু হায় রে হায়! দেখা গেল, তালাগুলো বড়ো বলেই হোক, বা চাবিটা ছোটো বলেই হোক, কোনো দরজাই তাতে খুলল না। যাই হোক, আবার একবার ঘুরতে ঘুরতে একটা বেঁটে পর্দা দেখতে পেলে, আগে সেটা চোখে পড়েনি। আর দেখতে পেলে, সেই পর্দার পেছনে ছোট্টো একটা দরজা—পনেরো ইঞ্চিটাক উঁচু। সোনালী সেই চাবিটা তাতে লাগাতে গিয়ে দেখলে—কী মজা রে, কী মজা—ঠিক লেগে গেল!

দরজা খুলে অ্যালিস দেখলে, তার ওপারেই ছোটো একটা সুড়ঙ্গ, ইঁদুরের গর্তের চেয়ে বিশেষ বড়ো নয়। গুঁড়ি মেরে বসে সেই সুড়ঙ্গের ভেতরে তাকিয়ে সে কী দেখতে পেলে? এমন সুন্দর বাগান কেউ কখনো দেখেনি। ঐ হল্‌ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ঐ-সব রঙবেরঙের ফুল আর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ফোয়ারার মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতে কী ভয়ানক ইচ্ছেই না হচ্ছে অ্যালিসের, কিন্তু ঐ দরজাটার মধ্য দিয়ে তার মাথাটাই



গলছে না, তা হবে কী! বেচারা অ্যালিস তখন ভাবছে, 'আর, মাথাটা যদিই-বা গলল, কাঁধ ছাড়া মাথাটা নিয়ে কীই-বা হবে! আহা রে, যদি টেলিস্কোপের মতো টুক টুক করে নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে সেঁধিয়ে ছোট্টো হয়ে যেতে পারতাম! হয়তো পারা যায়, কিন্তু কীভাবে আরম্ভ করতে হয় সেটাই যে জানা নেই ছাই!' ব্যাপার হল, এর মধ্যে এত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে যে, এখন প্রায় কিছুই আর অ্যালিসের কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে না।

দরজার কাছে বসে থেকে তো কোনো লাভ নেই, তাই সে আবার ফিরে চলল সেই টেবিলের কাছে, মনে মনে আশা, যদি আরো একটা চাবি পাওয়া যায়, কিম্বা এমন একটা বই, যাতে লেখা আছে কেমন করে নিজেকে টেলিস্কোপের মতো গুটিয়ে ছোটো করে নেওয়া যায়। এবার টেবিলের ওপর একটা ছোট্টো বোতল দেখা গেল (অ্যালিস বিড় বিড় করে বললে, "আগে এটা মোটেই এখানে ছিল না।") তার গলায় কাগজের লেবেল ঝোলানো, তাতে বড়ো-বড়ো হরফে সুন্দর করে ছাপা 'আমায় খাও'।

বলা তো খুব সোজা 'আমায় খাও', কিন্তু অ্যালিস অতো বোকা নয় যে, চট্ করে অমনি খেয়ে বসবে। বললে "না বাবা, আগে দেখি 'বিষ' বলে লেখা-টেখা আছে কি-না", কারণ, অ্যালিস অনেক সব

গল্প শুনেছে, কেমন করে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পুড়ে গেছে, বুনো জানোয়ারদের পেটে চলে গেছে, আরো কতোরকমের বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব ব্যাপার ঘটে গেছে তাদের কপালে, কেবল একটি মাত্র কারণে বন্ধু-বান্ধবরা যে-সব নিয়মকানুন শিখিয়েছে সে-সব গেরাহ্যি না-করা ; যেমন, উনুন-খোঁচানো গনগনে লোহার শিক অনেকক্ষণ ধরে থাকলে হাত পুড়ে যায় ; ছুরিতে আঙুল খুব বেশি কেটে গেলে সাধারণত রক্ত পড়ে ; আর,



এটা সে কিছুতেই ভোলেনি, 'বিষ' লেখা বোতলের জিনিস বেশি-বেশি খেয়ে ফেললে, আগেই হোক আর পরেই হোক সেটা যে সইবে না, এটা নিশ্চয়ই ।

অবশ্য এ-বোতলটায় 'বিষ' লেখা নেই, কাজেই অ্যালিস সাহস করে একটু চেখে দেখলে, আর খেতে খুব সুন্দর লাগল দেখে (গন্ধটা আসলে ছিল চেরির চাটনি, কাস্টার্ড, আনারস, ঝল্‌সানো টার্কি, টফি আর গরম মাখন-লাগানো টোস্টের গন্ধ মেশালে যা হয়, তাই) খানিকক্ষণের মধ্যেই বোতলটা খালিই করে ফেললে ।

"কী অদ্ভুত লাগছে আমার! নিশ্চয়ই টেলিস্কোপের মতো ছোটো হয়ে যাচ্ছি।"

ঠিক তাই; এখন সে মাথায় মাত্র দশ ইঞ্চি লম্বা! এবার যে সে ঐ ছোট্টো দরজা দিয়ে গলে সেই বাগানে যেতে পারবে, এই কথা মনে হতেই তার মুখটা খুশীতে ঝল্‌মল করে উঠল। অবশ্য, প্রথম কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখে নিল যে, এখনো সে আরো ছোট হচ্চে কি-না; কথাটা ভেবে একটু ভড়কে যাচ্ছিল সে। অ্যালিস তখন বলছে, "কারণ, বুঝতেই পারছ, এমনি চলতে থাকলে একেবারে তো ভোঁ-ভাঁ হয়ে যেতে পারি, পুড়ে পুড়ে মোমবাতির মতো দশা! তখন আমায় কেমন দেখতে হবে, কে জানে?" নিবে যাবার পর মোমবাতির আলো কেমন দেখতে হয়, তাই ভাবতে চেষ্টা করতে লাগল অ্যালিস, কারণ সত্যি সত্যি সে-জিনিস কখনো দেখেছে বলে তার মনে তো পড়ে না।

কিছুক্ষণ বাদে যখন দেখলে নতুন করে আর কিছু হচ্ছে না, তখন ঠিক করলে এক্ষুনি সেই বাগানে যেতে হবে। কিন্তু, হায় রে, অ্যালিস বেচারির কপালটাই খারাপ! দরজার কাছে গিয়ে দেখলে চাবিটা ফেলে এসেছে; আবার টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলে, টেবিলের ওপর পর্যন্ত তার নাগালই পৌঁছায় না; নিচে থেকে কাঁচের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল চাবিটা, টেবিলের একটা পায়া বেয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টাও করল, কিন্তু বড্ডো পিছলে যায়। বার বার চেষ্টা করে যখন আর পারে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন ছোট্টো ফুটফুটে অ্যালিস বেচারি মাটিতে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তার পর অ্যালিস যেন ধমকের সুরে নিজেকেই বলে ওঠে, "চুপ করো, এভাবে কেঁদে কিছু লাভ আছে?" অ্যালিস বরাবরই নিজেকে ভালো-ভালো সব পরামর্শ দিয়ে থাকে (যদিও সে-সব বেশির ভাগই সে মানে না), আর মাঝে মাঝে এমন কড়া ধমক দেয়, যে চোখে জল এসে যায়। তার মনে আছে, নিজের সঙ্গে নিজে ক্রোকে খেলবার সময় একবার নিজের সঙ্গে নিজে জোচ্চুরি করবার জন্যে নিজেই নিজের কান মলতে গিয়েছিল। ব্যাপার হল, অ্যালিস মেয়েটা অদ্ভুত, নিজেকে দু'জন মনে করতে তার ভারী আনন্দ। এবার কিন্তু অ্যালিস ভাবছে, 'নিজেকে দু'জন মনে করে এখন আর কোনো লাভ হবে না! 'আমি' বলতে এখন যেটুকু বজায় আছে, তাতে ভদ্রগোছের একটা মানষই হয় কি-না সন্দেহ!'

ভাবতে-না-ভাবতেই তার চোখ পড়ল টেবিলের নিচে একটা কাঁচের বাক্সের দিকে। বাক্সটা খুলে দেখে, তার মধ্যে খুব ছোট্টো একটা কেক, তার ওপর খুদে খুদে কিশমিশ সাজিয়ে লেখা রয়েছে, 'আমায় খাও'। দেখে অ্যালিস বললে, "ঠিক আছে, খেয়েই ফেলি ; তাতে যদি বড়ো হয়ে যাই, চাবিটা নিতে পারব, আর, যদি আরো ছোটো হয়ে যাই, তা হলে দরজা গলে বেরিয়ে পড়তে পারব ; কাজেই যেভাবেই হোক বাগানে পৌঁছতে তো পারব, যা-ই ঘটুক, তাতে বয়েই গেল আমার !"

ছোট্টো একটা কামড় দিল কেকে, দিয়েই মনে মনে বলতে লাগল, 'কোন্ দিকে—ছোটোর দিকে, না বড়োর দিকে ?" মাথার ওপর হাত রেখে বুঝতে চেষ্টা করল, বাড়ছে না কমছে, আর আশ্চর্য হয়ে দেখল, যেমনকার তেমনি রয়েছে। আসলে কেক খেলে সাধারণত তা-ই হয়, মানুষ বাড়েও না কমেও না, কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই ঘটবে না বলে অ্যালিস এতো বেশি আশা করে ফেলেছে যে, এখন সহজ স্বাভাবিক কিছু ঘটলে মনে হচ্ছে, নেহাৎ-ই পান্‌সে, নেহাৎ বোদা।

কাজেই সে মুখ চালাতে লাগল, কেকটাও খতম হতে সময় লাগল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চোখের জলের পুকুর

"আশ্চদ্দভুত, আশ্চদ্দভুত !" (এতো অবাক হয়ে গেছে অ্যালিস যে, ভাষা-টাষা ভুলে মেরে দিয়েছে।) "ইকী! প্রকান্ড একটা টেলিস্কোপের মতো ক্রমে ক্রমে লম্বা হয়ে উঠছি যে। চললুম ভাই, পা !" (নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পা-জোড়া এতো দূরে যে, প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।) "আহা রে, আমার পা ; কেই-বা তাদের আর এখন জুতো-মোজা পরিয়ে দেবে—বাছা রে! আমার দ্বারা যে হবে না, সে তো বোঝাই যাচ্ছে! এতো দূরে থেকে কি আর তোদের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো যায় ; যতটা পারিস নিজেরাই সামলে-সুমলে নিস্ !" তার পর ভাবলে, 'কিন্তু ওদের ওপর একটু মায়া-টায়া দেখানো দরকার, নাহলে হয়তো আমার ইচ্ছেমতো চলতেই চাইবে না! ঠিক আছে, প্রত্যেক বড়োদিনে ওদের একজোড়া করে নতুন জুতো উপহার দেওয়া যাবে।'

তার পর অ্যালিস ভাবতে বসল, কী ভাবে কী করা যায়। 'কারো হাত দিয়ে তো পাঠাতে হবেই। নিজের পা-কে নিজেই উপহার দেওয়া —ব্যাপারটা কী অদ্ভুত না ? আর, পাঠাবার ঠিকানাটাই-বা কেমন দাঁড়াবে।



অ্যালিসের দক্ষিণ-শ্রীচরণেষু,
আগুন পোয়াবার চুল্লির সামনেকার পা মেলবার কম্বল,
চুল্লির রেলিঙের কাছাকাছি,
(অ্যালিসের ভালোবাসা রইল)।

দুত্তেরিকা, কী-সব আবোল-তাবোল বকছি !'

ঠিক এই সময়ে ঠক্ করে তার মাথাটা ঘরের ছাদে গিয়ে ঠেকল ; আসলে সে এখন ন' ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা হয়ে গেছে, চট করে

টেবিলের উপর থেকে সোনালী চাবিটা তুলে নিয়ে দৌড় দিয়েছে সেই বাগানে যাবার দরজাটার দিকে।

বেচারা অ্যালিস! পাশ ফিরে শুয়ে কোনোরকমে একটা চোখ দরজার ফাঁকে লাগিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই এখন সম্ভব নয় তার পক্ষে; দরজা দিয়ে বাগানে যাওয়া এখন তো আরো বেশি অসম্ভব। আবার বেচারা কাঁদতে বসল।

"ছি, ছি, বুড়োধাড়ি মেয়ে হয়ে (তা বলতে পারে বটে) কাঁদতে লজ্জা করে না তোমার! এক্ষুনি চুপ করো, বলছি!" বললে আর কী হবে, কেঁদেই চলল, কেঁদেই চলল, জালা জালা জল পড়তে লাগল তার চোখ দিয়ে। তার চারি দিকে ইঞ্চি-চারেক গভীর প্রকাণ্ড একটা পুকুরের মতো তৈরি হয়ে গেল, ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে জল জমে উঠল; তখন অ্যালিসের কান্না থামল।

খানিক বাদে শুনতে পেলে পুটুর পুটুর করে কার পায়ের আওয়াজ, তাড়াতাড়ি চোখ পুঁছে অ্যালিস দেখতে লাগল, কে আসে। কে আসছে? সেই সাদা খরগোশটা ফিরে আসছে। কী জমকালো সাজ। এক হাতে একজোড়া সাদা দস্তানা, আর-এক হাতে বিরাট একটা জাপানী পাখা। হন্ হন্ করে এগিয়ে আসতে আসতে বিড়-বিড় করে খরগোশভায়া বলে চলেছে, "ওরে ব্বাবা, জমিদারগিন্নী! যদি সত্যিই আমার জন্যে তাঁকে বসে থাকতে হয়, তাহলে কী বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ডই না করবেন!" অ্যালিস তখন এমন মরিয়া হয়ে গেছে যে, যার কাছেই হোক একটু সাহায্য পেলে বাঁচে; তাই, খরগোশটা তার কাছাকাছি এসে পড়তেই ভয়ে ভয়ে মিনমিন করে সে যেই বলতে শুরু করেছে, "দেখুন মশাই, কিছু মনে করবেন না—", খরগোশটা বেজায় চমকে উঠে দস্তানা আর পাখাটাখা ফেলে চোঁ চাঁ দৌড় দিয়ে অন্ধকারে ভোঁ হয়ে গেল।

অ্যালিস আর কী করে, দস্তানা আর পাখাটা কুড়িয়ে নিলে, তার পর, ঘরটা গরম বলে সেই পাখাটা নাড়িয়ে হাওয়া খেতে খেতে বক্ বক্ করতে লাগল: "বাবা রে বাবা! কী অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারই না ঘটছে আজ! অথচ কালকে তো সবই ঠিকঠাক চলেছে। কী জানি বাবা, রাতারাতি বদলে যাইনি তো? দেখি তো ভেবে: আজ সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন সেই আগের মতোই ছিলুম তো?



না, মনে পড়ছে, একটু যেন অন্যরকম লাগছিল লাগছিল বটে। বেশ, আমি যদি আগের মতো সেই অ্যালিসই না হই, তা হলে এবার প্রশ্ন উঠছে—আমি তা হলে কোন্ চুলোর কে? হুঁ হুঁ ব্বাবা, এটাই হল সমস্যা।" তার পর, চেনাজানা সমবয়সী ছেলেমেয়েদের কথা মনে করে করে দেখতে লাগল যে, সে বদলে গিয়ে তাদের কেউ হয়ে গেছে কি-না।

বলল, "আমি এডা নই নির্ঘাৎ, কারণ তার চুল কেমন কোঁকড়ানো, আমার চুল তো একদম সোজা। আর, আমি মেবেল-ই বা হব কী করে, কারণ আমার কত জ্ঞানগম্যি, আর মেবেল? ওঃ, কীই-বা জানে বেচারা! আর, তাছাড়া, মেবেল হল মেবেল, আর আমি হচ্ছি আমি, আর দূর-ছাই, যাচ্ছেতাই গোলমেলে ব্যাপার সব। আচ্ছা, এবার দেখা যাক, যা যা জানতুম, সব এখনো মনে

আছে কি-না। দেখি তো: চার-পাঁচে বারো, আর, চার-ছয়ে তেরো, আর, চার-সাত্তে হল—হায় কপাল! এরকম করলে তো কুড়ি পর্যন্ত পৌঁছনোই যাবে না! যাক গে, নামতা দিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। ভূগোল নিয়ে বেয়েচেয়ে দেখা যাক: প্যারিসের রাজধানী হল গিয়ে লণ্ডন, আর রোমের রাজধানী হল প্যারিস, আর রোম হচ্ছে—নাঃ, সব ভুল, সমস্ত ভুল, বেশ বুঝতে পারছি একটাও ঠিক নয়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি মেবেল হয়ে গেছি। দেখি তো চেষ্টা করে, সেই কবিতাটা বলতে পারি কি-না, 'ছোট্টো...শুয়ে শুয়ে'; তার পর সে পড়া-বলার মতো করে কোলের ওপর হাত জড়ো করে ছড়া আওড়াতে লাগল। কিন্তু, গলার আওয়াজটা যেন কেমন ভাঙা ভাঙা আর অদ্ভুত শোনাচ্ছে; তা ছাড়া কবিতাটাও ঠিক আসলের মতো হচ্ছে না—

"(আহা) ছোট্টো কুমির কেমন শুয়ে শুয়ে
শান দিয়ে নেয় ঝক্‌ঝকে তার ল্যাজে,
নীল নদেরই জলের ধারায় ধুয়ে
সোনার বরণ আঁশগুলি তার মাজে।

(আহা) ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই আছে,
থাবাখানি আগায় সে নিঃসাড়ে
হাসিমুখের ভেতর চুনো মাছে
আদর করে ডাকছে বারে বারে।"

"নাঃ, কথাগুলো বিলকুল ভুল হচ্ছে," বলতে বলতে বেচারা অ্যালিসের দু'চোখে আবার জল এসে গেল, "শেষ অবধি মেবেলই হয়ে গেছি দেখছি। তার মানে আমায় এখন গিয়ে থাকতে হবে সেই ঘুপসি বাড়িটাতে, খেলা করতে পুতুলও জুটবে না কপালে, আর, ওফ্! কত পড়াই না মুখস্থ করতে হবে আমায়। নাঃ, একেবারে পাকাপাকি মন ঠিক করে ফেলা যাক; যদি মেবেল-ই হই, তাহলে এখানে এই পাতালপুরীতেই থাকব! ওরা যদি গর্তের ওপর থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে ডাক পাড়ে 'ওপরে এস গো সোনামণি', তা হলে ওপরবাগে চেয়ে চেঁচিয়ে বলব, 'আমি তা হলে কে? সেটা আগে বলে দাও, যদি সেই মেয়ে হতে আমার আপত্তি না-থাকে, তবেই ওপরে যাব,

তা নইলে রইলুম এইখানে বসে, যতক্ষণ না অন্য কেউ হয়ে যাই'—কিন্তু, মাগো মা।" অ্যালিস হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, "ভগবান, সত্যিই যেন ওরা কেউ গর্তের ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে আমায় ডাকে! একা একা থাকতে যে আর পারি না গো!"

এই বলতে বলতে নিজের হাতের দিকে চোখ পড়তেই দ্যাখে যে বকর বকর করতে করতে কখন খরগোশভায়ার একটা দস্তানা সে পরে ফেলেছে, কী আশ্চর্য? অ্যালিস ভাবছে, 'কী করে পরতে পারলুম? নিশ্চয়ই তা হলে আবার ছোটো হয়ে যাচ্ছি!' অ্যালিস উঠে পড়ল, টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে মেপে দেখলে; হ্যাঁ, যদ্দূর মনে হচ্ছে, লম্বায় এখন সে ফুট দুয়েক হবে; শুধু তাই নয়, হু হু করে ক্রমশ আরো ছোটো হয়ে যাচ্ছে! চট্ করে সে বুঝে নিলে যে, তার হাতের ঐ পাখাটাই হচ্ছে যতো নষ্টের গোড়া। ঝট্ করে পাখাটা ফেলে দিলে! ভাগ্যিস ফেলে দিলে, নইলে আর একটু হলেই ছোটো হতে হতে একেবারে ভোঁ হয়ে যেত সে।

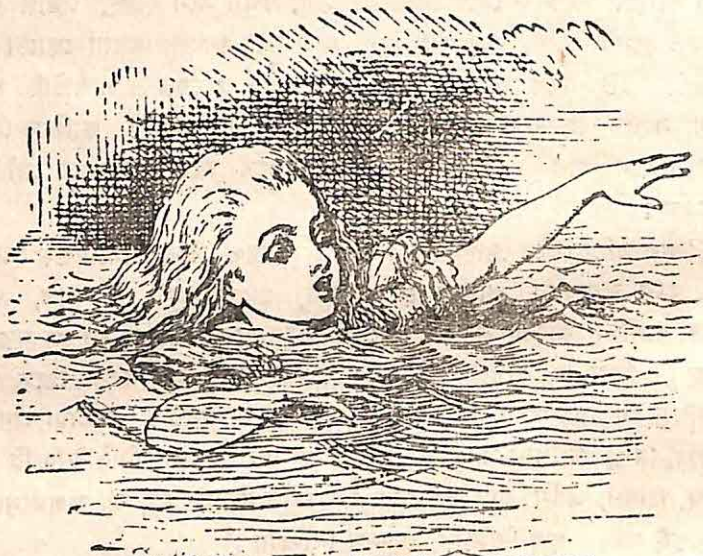
"খুব বাঁচা বেঁচে গেছি রে বাবা!" হঠাৎ বদলে গিয়ে ভয় পেয়েছে বটে, তবে একেবারে ফুরিয়ে যে যায়নি, তাতেই খুশী। "ব্যস, এবার সোজা বাগানে যাওয়া যাক", বলেই সাঁ করে ফিরে এল সে দরজার কাছে। কিন্তু, ও হরি! দরজাটা কখন যেন বন্ধ হয়ে গেছে, আর চাবিটাও আগের মতো ফিরে গেছে টেবিলের ওপর। বেচারা অ্যালিস ভাবলে, 'নাঃ, ব্যাপার-স্যাপার দেখছি ক্রমশই আরো বিদিকিচ্ছিরি হয়ে যাচ্ছে, কারণ, আমি তো এত ক্ষুদে কখ্খনো ছিলাম না, না, কখ্খনো না, কিছুতেই না! খুব বিচ্ছিরি, একদম বিচ্ছিরি!'

এই-সব ভাবছে, আর অমনি পা পিছলে ঝপাং! গলা অবধি নোনা জলের মধ্যে পড়ে গেছে অ্যালিস। প্রথমে ভাবলে কেমন করে সুমুদ্দুরে পড়ে গেছে বোধ হয়। মনে মনে বললে, 'তা যদি হয়, তা হলে রেলে করে ফিরে যেতে পারব।' (জীবনে একবারই সে সুমুদ্দুর দেখেছে; সেখানে যা দেখেছে, তাই থেকে তার ধারণা হয়েছে যে, ইংলণ্ডের যে-কোনো জায়গায় সুমুদ্দুরের ধার হলেই সেখানে ছেলে-মেয়েরা বালি নিয়ে খেলা করে, তার পরেই থাকে একসার বাসাবাড়ি, আর তার পেছনে রেলের ইস্টিশান।) যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারলে যে, সুমুদ্দুর নয়, ন'ফুট লম্বা অবস্থায় সেই

যে সে অঝোরে কেঁদে ভাসিয়েছিল, এ জল তারই—পুকুর হয়ে গেছে।

সাঁতরাতে সাঁতরাতে অ্যালিস ভাবলে, 'নাঃ, অতোটা কাঁদা ঠিক হয়নি! নিজের চোখের জলে নিজেই ডুবে যাওয়া—কী শাস্তি তোলা আছে তার জন্যে কে জানে! কী অদ্ভুত কাণ্ড হবে তা হলে। অবশ্য আজকের তো সবই অদ্ভুত।'

ঠিক এমনি সময়ে সে শুনতে পেলে খানিকটা তফাতে জলের মধ্যে ছপ্ ছপ্ শব্দ। সাঁতরে এগিয়ে দেখতে গেল ব্যাপারটা কী।



চোখে যা পড়ল, তাতে প্রথমে মনে হল সিন্ধুঘোটক বা জলহস্তী কিছু একটা হবে; কিন্তু চট্ করে মনে পড়ে গেল, সে নিজে তো এখন পুঁচকে হয়ে গেছে। কাজেই বুঝতে দেরি হল না যে, জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা নেংটি ইঁদুর, তারই মতো হড়কে জলে পড়ে গেছে।

অ্যালিস ভাবলে, 'নেংটির সঙ্গে আলাপ করে কিছু লাভ হবে কি? এখানকার ব্যাপার-স্যাপার যেরকম কিম্ভূত দেখছি, বলা যায় না, নেংটি ইঁদুরও হয়তো কথা বলতে পারে। যাই হোক, একবার পরখ করে

দেখলে তো ক্ষতি নেই।' এই-না ভেবে অ্যালিস বলতে শুরু করলে, "হে নেংটি, এই পুকুর থেকে বেরোব কিভাবে বলতে পারো কি? সাঁতার কাটতে কাটতে হাত-পা এলিয়ে পড়ছে আমার, নেংটি হে।" (অ্যালিস ভেবেছে, নেংটি ইঁদুরের সঙ্গে আলাপ করার এটাই নিশ্চয়ই ঠিক নিয়ম; আগে অবশ্য কখনো ইঁদুরের সঙ্গে তার আলাপ করার দরকার পড়েনি, তবে তার দাদার ব্যাকরণের বইতে দেখেছে, 'একটি নেংটি ইঁদুর—একটি নেংটি ইঁদুরের—একটি নেংটি ইঁদুরকে—হে নেংটি ইঁদুর!') নেংটি সেই শুনে বেশ একটু ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালো একবার, মনে হলো একবার যেন চোখ মটকালে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

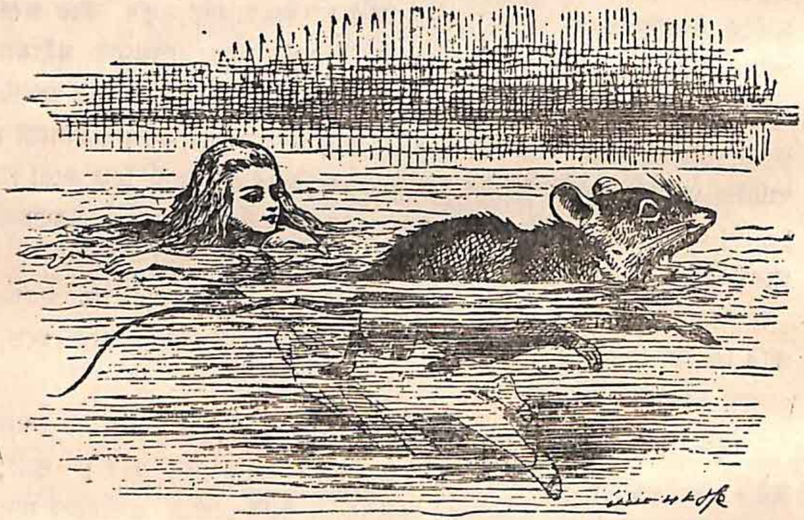
অ্যালিস ভাবলে, 'ইংরেজী বোঝে না বোধ হয়। হুঁ, ঠিক ধরেছি, ফরাসী নেংটি হবে নিশ্চয়ই, উইলিয়াম দি কঙ্কারার-এর সঙ্গে এদেশে এসেছে।' (ইতিহাসে অ্যালিসের যা জ্ঞান, তাতে কোন্ ঘটনা কবে ঘটেছে, বিলকুল কিচ্ছু তার জানা নেই।) সে আবার নতুন করে শুরু করলে, "উ এ মা শ্যাট?" অ্যালিসের ফরাসী ভাষা শেখবার বইয়ের প্রথম পাঠেই ঐ কথাগুলো আছে। শুনেই নেংটিটা তিড়িং করে জলের ওপর লাফিয়ে উঠলো একবার, তার পর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। অ্যালিস তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "আহা আহা, মাফ কর ভাই, মাফ করো!" বেচারা নেংটির মনে কষ্ট দেবার তার একদম ইচ্ছে ছিলো না! "একদম মনেই ছিলো না ভাই, যে, বেড়াল-টেড়াল মোটেই পছন্দ করো না তুমি।"

সরু কাঁপা-কাঁপা গলায় নেংটি ফেটে পড়লো, "বেড়ালদের পছন্দ করি কি-না! পছন্দ করি কি-না! পছন্দ! তুমি যদি আমি হতে, করতে পছন্দ?"

খুব শান্ত গলায় অ্যালিস জবাব দিলে, "না, করতাম না বোধ হয়। যাই হোক, এ নিয়ে আর রাগারাগি করো না, ভাই। তবে, একটা কথা তবু আমি বলবোই, আমাদের মিনি বেড়াল ডাইনাকে যদি একবার দেখাতে পারতুম তোমায়; একবার দেখলে বেড়ালের ওপর তোমার টান ধরে যেতো। আহা, ডাইনা আমার কী মিষ্টি, আর কী শান্ত।"—সেই পুকুরে গা ভাসিয়ে আস্তে আস্তে সাঁতার কাটতে কাটতে অ্যালিস খানিকটা যেন আপন মনেই বলে চললো,—"আগুনের ধারে ঘড় ঘড় শব্দ করে কী সুন্দর করে বসে থাকে, থাবা চাটে, মুখ পরিষ্কার করে—আর কী নরম, আদর করতে কী ভালোই যে লাগে—আর ইঁদুর

ধরতে যে কী ওস্তাদ—ওঃ হো, না না, মাফ করো, ভাই, মাফ করো, ঘাট হয়েছে !" ভুল বুঝতে পেরে অ্যালিস আবার খুব ঘটা করে ক্ষমা-টমা চাইলে, কেননা নেংটির এবার গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ; অ্যালিস বেশ টের পেলে, বড়ো বেশি লেগেছে বেচারির মনে। "ঠিক আছে, যখন পছন্দই করো না, তখন ডাইনার কথা আর না-ই বললাম আমরা।"

"একশো বার পছন্দ করি না, হাজার বার পছন্দ করি না !" নেংটির এখন ল্যাজের ডগা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপছে। "হুঁঃ ইয়ের কথা বলতে আমার বয়েই গেছে ! আমার বংশের সব্বাই বরাবর বেড়ালকে ঘেন্না করে এসেছে ; বদখত ছোটলোক, বিদিকিচ্ছিরি জিনিস একটা ! আর যেন কখনো তোমার মুখে ও নাম না-শুনি !"



"নিশ্চয়ই না, কখোনো বলবো না।" কথা ঘোরাবার জন্যে তাড়াতাড়ি এই বলে অ্যালিস অন্য কথা পাড়লে, "তুমি কি—তুমি কি—মানে কুকুর ভালো লাগে তোমার ?" নেংটি কোনো জবাব দিলো না দেখে অ্যালিস বেশ জমিয়ে বলতে লাগলো, "আমাদের বাড়ির কাছে কী সুন্দর ছোট্টো একটা কুকুর আছে, একবার যদি দেখতে তাকে। চোখ দুটো কেমন চকচকে, ছোট্টো একটা টেরিয়ার কুকুর, আর, আহা, এত্তো বড়ো-বড়ো

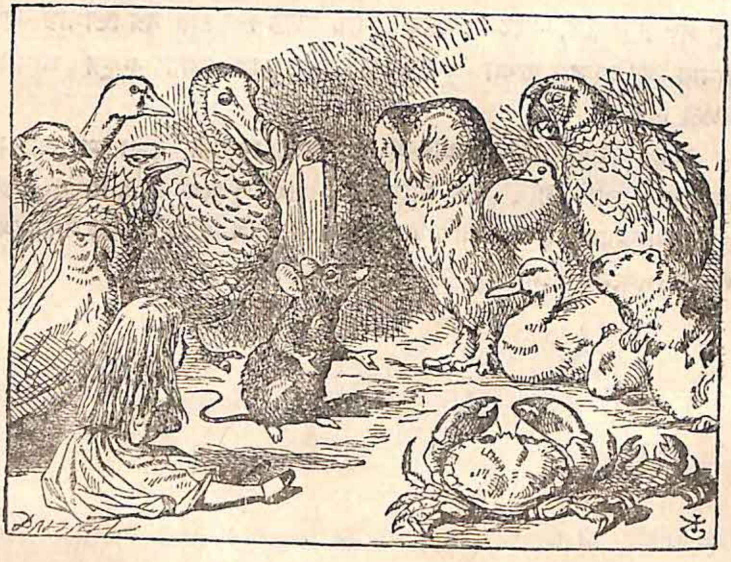
কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো বাদামী লোম তার গায়ে। কোনো জিনিস ছুঁড়ে দাও, ঠিক নিয়ে আসবে, দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে কেমন খাবার চাইবে, আরো কতো কী যে সব করবে, কতোই-বা বলবো, আদ্দেক তো মনেই পড়ছে না। কুকুরটা একজন চাষীর, বুঝলে? চাষী বলে, 'কুকুটা এতো কাজের, তার দাম হবে একশো পাউণ্ড।' বলে, 'কুকুরটা মেরে মেরে ইঁদুরের উলকুল উজাড় করে'—ঐ যাঃ, পোড়া কপাল আমার! আবার চটালাম না-কি!" নেংটি ততক্ষণে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে কাটতে জল তোলপাড় করে অ্যালিসের কাছ থেকে সরে পড়ছে।

অ্যালিস খুব মিষ্টি করে পিছন থেকে ডেকে বললে, "নেংটি-সোনা! ফিরে এসো না ভাই, তোমার যখন ভালোই লাগে না, বেশ, বেড়াল বা কুকুর, কারো কথাই তুলবো না আর।" কথাটা কানে গেলো; নেংটি মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে সাঁতরে ফিরে এলো অ্যালিসের কাছে। মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, (বোধ হয় রাগের চোটে) খুব কাঁপা-কাঁপা নিচু গলায় বললে, "চলো, পাড়ে গিয়ে উঠি। তার পর তোমায় বলবো আমার ইতিহাস, তখন বুঝবে, কেন বেড়াল আর কুকুর আমার দু চক্ষের বিষ।"

এবার পাড়ে ওঠা নেহাৎ-ই দরকার, কেননা ততক্ষণে আরো সব নানারকম পাখি-টাখি জন্তু-জানোয়ার সেই পুকুরে থিক্‌থিক্ করছে। পাতিহাঁস আছে, ডোডো পাখি আছে, তোতা পাখি আছে, বাচ্চা ঈগল আছে, পেছনে পেছনে চললো আর সবাই—পাড়ের দিকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দঙ্গল-দৌড় আর লম্বা ল্যাজ



পাড়ে এসে যখন সবাই জড়ো হলো, তখন দেখা গেলো, কী ছিরিই খুলেছে সব। পাখি-টাখিদের পালকগুলো নোংরা-ঝোংরা, জানোয়ার-গুলোর লোম-টোম সব ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে, সবাই ভিজে চুপচুপে, সবারই মেজাজ তিরিক্ষি, বদখত লাগছে।

প্রথম কথা হলো শুকনো হওয়া যায় কী করে ; এ নিয়ে খানিকটা কথাবার্তা হলো, আর, খানিক বাদেই অ্যালিস দেখলে, ওদের সঙ্গে দিব্যি আপনজনের মতোই আলাপ করছে সে, যেন কতো কালের চেনা। তোতা পাখিটার সঙ্গে তার তো বেশ কথা-কাটাকাটিই হয়ে গেলো এক-চোট। শেষ পর্যন্ত একগুঁয়ে কচি খোকার মতো হাঁড়িমুখ করে তোতা বললে, "আমি বয়েসে তোমার চেয়ে বড়ো, কাজেই, তোমার চেয়ে বেশি জানি।" কিন্তু বল্লেই তো হলো না, তোতার বয়েসটা তো জানা চাই ; কিন্তু তোতা যখন সাফ জবাব দিলে যে, সে বয়েস-ফয়েস বলবে না, তখন আর কী, চুপ করেই থাকতে হয়।

নেংটিকেই ওর মধ্যে একটু মুরুব্বি মুরুব্বি মনে হয়। শেষমেস সে-ই হাঁকলে, "বসো সবাই, বসে পড়ো, আমি যা বলি, শোনো। এক্ষুনি আমি তোমাদের শুকিয়ে দিচ্ছি।" সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লো সবাই গোল হয়ে, মাঝখানে রইলো নেংটি। অ্যালিস তার দিকে চেয়ে আছে বড়ো আগ্রহ নিয়ে, কারণ বুঝতে পারছে, আর বেশিক্ষণ এমনি ভিজে অবস্থায় থাকলে, নির্ঘাৎ সর্দি লেগে যাবে।

"হুম!" বলে বেশ ভারিক্কি চালে শুরু করলে নেংটি, "তৈরি আছো তো সবাই। সবচেয়ে রস-কষহীন শুকনো জিনিস যা জানি, তাই-ই তোমাদের বলবো, চুপ করে ঠাণ্ডা হয়ে বসো সবাই। উইলিয়াম দি কঙ্কারার, যাঁর পক্ষে ছিলেন পোপ, স্বল্পকালমধ্যেই আনুগত্য লাভ করিলেন ইংলণ্ডবাসীর, যাহারা ইদানীং অন্যায় দখল আর রাজ্যজয়ের ঘটনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল! মার্সিয়া এবং নর্দাম্বার-ল্যাণ্ডের আর্ল, এডুইন এবং মর্কার—"

এই জায়গায় হঠাৎ শিউরে উঠে তোতা বলে ফেললে, "ওফ্!"

ভুরু কুঁচকে নেংটি বললে—নরম হয়েই বললে অবশ্য, "কী বললে। তুমি বললে না-কি!"

লরী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "না, না, আমি নই।"

নেংটি বললে, "আমার মনে হলো, তুমিই যেন কিছু বললে। যাই-হোক, আমি তা হলে ফের শুরু করি! মার্সিয়া এবং নর্দাম্বারল্যাণ্ডের আর্ল, এডুইন এবং মর্কার উইলিয়ামের প্রতি তাহাদের সমর্থন ঘোষণা করিল, এবং ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ ইহা দেখিলেন যে—"

হাঁস বললে, "কী দেখিলেন?"

(শীতকাল পড়লে কোনোদিন হয়তো তোমাদেরও করে দেখতে ইচ্ছে হতে পারে, তাই ডোডো কী ব্যবস্থা করলে জানিয়ে রাখছি।)

প্রথমেই ডোডো দৌড়ের পাল্লা ছকে দিলে গোল মতন একটা দাগ দিয়ে (বললে, "গোল হবে কি চৌকো হবে তাতে কিস্যু আসে-যায় না।") তার পর দলের সবাইকে সেই দাগের এখানে-ওখানে দাঁড় করানো হলো। 'রেডি, সেডি, গো—' এ-সবের বালাই নেই, যার যখন খুশি দৌড়চ্ছে, আবার যখন খুশি থেমে পড়ছে, কাজেই, দৌড় যে কখন শেষ হচ্ছে, বোঝাই গেলো না। তবে, আধ ঘণ্টাটাক দৌড়বার পর যখন দেখা গেলো সবাই বেশ শুকিয়ে গেছে, তখন ডোডো হেঁকে উঠলো, "দৌড় খতম।" তখন সব্বাই তাকে ঘিরে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, "জিতলো কে ?"

উত্তর দিতে গিয়ে ডোডোকে বেশ চিন্তায় পড়তে হলো, কপালে একটা আঙুল রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো (বড়ো-বড়ো পণ্ডিতদের ছবিতে যেমন দেখা যায়), আর বাকি সবাই চুপটি করে অপেক্ষা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ বাদে ডোডো শেষকালে ফতোয়া দিলে, "সব্বাই জিতেছে, সব্বাই পুরস্কার পাবে।"

একসঙ্গে অনেকগুলো গলা শোনা গেল এবার, "কিন্তু পুরস্কার দেবে কে ?"

আঙুল দিয়ে অ্যালিসকে দেখিয়ে ডোডো বললে, "কে আবার, ঐ মেয়েটা!" আর, সঙ্গে সঙ্গে সব্বাই মিলে অ্যালিসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হট্টগোল করে চেঁচাতে লাগলো, "প্রাইজ দাও, প্রাইজ!"

অ্যালিস তো ভেবেই পাচ্ছে না, কী করা যায় ; ভেবে কূল না-পেয়ে ঘাগরার পকেটে হাত ঢোকালে। সেখান থেকে বেরোল শুকনো মোরব্বার বাক্স (ভাগ্যিস তার মধ্যে নোনা জল ঢোকেনি), সেই থেকে সবাইকে একটা-একটা দিলে। একেবারে টায়ে টায়ে কুলিয়ে গেলো।

নেংটি তখন বললে, "কিন্তু, ও নিজেও তো একটা প্রাইজ পাবে, না-কী ?"

ডোডো খুব গ্রাম্ভারি চালে বললে, "একশো বার, একশো বার।" তার পর অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমার পকেটে আর কী আছে ?"

নেংটি একটু কড়া সুরে বললে, "কী আবার দেখিলেন, 'ইহা' দেখিলেন। 'ইহা' মানে জানা আছে নিশ্চয়ই!"

হাঁস বললে, "আমি নিজে যখন কিছু দেখি, তখন বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না, 'ইহা' মানে কী। তখন 'ইহা' মানে হয় ব্যাঙ, না হয় কেঁচো। কিন্তু কথা হলো, আর্চবিশপ দেখিলেনটা কী!"

নেংটি কথাটা গায়েই মাখলে না, বলে চলল, "—দেখিলেন যে, এড্গার অ্যাথেলিঙ্-এর সমভিব্যাহারে উইলিয়ামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে রাজমুকুট অর্পণ করাই সঙ্গত হইবে। উইলিয়ামের আচরণ আদিতে ছিল মিতাচারীর ন্যায়। কিন্তু নরম্যানদের ঔদ্ধত্যের ফলে—' এখন কেমন লাগছে গো সব।" বলতে বলতে অ্যালিসের দিকে তাকালে।

অ্যালিস দুঃখুদুঃখু গলায় বললে, "যেমনকার তেমনি ভিজে হয়ে রয়েছি, মোটেই শুকোইনি!"

তখন ডোডো উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর চালে বললে, "সে ক্ষেত্রে, আরো কড়া ধাঁচের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্যে সভা মুলতুবি রাখা হোক—"

ঈগল-ছানা বললে, "সাদা-মাঠা ভাষায় কথা বলো-না দাদা, ঐ সব লম্বা লম্বা কথার আদ্দেকের মানেই বুঝি না, আর, শুধু তাই নয়, তুমি নিজেও যে বোঝো, তাও বিশ্বাস করি না।" বলতে বলতে ঈগল-ছানা ঘাড় নিচু করে হাসিটা আড়াল করলে; অন্য অনেক পাখি শব্দ করেই খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলো।

দমে গিয়ে ডোডো তখন বেচারি-পানা গলায় বললে, "আসলে আমি বলতে চাইছিলাম কি যে, শুকনো হবার সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে দঙ্গল-দৌড়।"

"দঙ্গল-দৌড় আবার কী জিনিস?" আসলে অ্যালিসের যে সত্যিই জানবার ইচ্ছে হয়েছে তা নয়, তবে, ডোডো কথা বলতে বলতে এমনভাবে থেমে গেলো যে, মনে হলো, কারুর-না-কারুর কিছু একটা কথা বলা দরকার, নইলে ভালো দেখায় না; অথচ অ্যালিস ছাড়া আর কেউ যে মুখ খুলবে, তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না!

ডোডো বললে, "কথায় কাজ কী, করে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

অ্যালিস করুণ গলায় বললে, "শুধু ছোট্টো একটা আঙুল-ঢাকা টোপর, সেলাই করবার সময়ে পরে, যাতে ছুঁচ ফুটে না-যায়।"

ডোডো বললে, "দাও তো আমাকে।"

আবার সবাই অ্যালিসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর ডোডো মন্তর পড়ার মতো গম্ভীরভাবে বললে, "এই অতি সুন্দর বস্তুটি গ্রহণ করে আমাদের সবাইকে কৃতার্থ করো।" ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাহবা দিতে শুরু করলে।

পুরো ব্যাপারটাই উদ্ভট লাগছে অ্যালিসের, কিন্তু সবাই যেরকম গম্ভীরভাবে করছে-কম্মাচ্ছে, হাসতে সাহস হলো না ; কী যে বলবে, তাও ভেবে পেলো না, মাথাটা একবার সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে সেই আঙুল-ঢাকাটা নিলে, যতটা পারা যায় গম্ভীর হয়ে রইলো।

এবার সেই শুকনো মোরব্বা খাওয়ার পালা। খাওয়ার সময়ে বেশ খানিকটা গোলমাল হলো, হট্টগোল হলো, কারণ, বড়ো-বড়ো পাখিরা নালিশ জানাতে লাগলো যে, ভালোমতো স্বাদ পাবার আগেই মোরব্বা পেটে চলে গেছে, আর ছোটো-ছোটো পাখিদের বেলা মোরব্বার টুকরো গেলো গলায় আটকে, পিঠে থাবড়া মেরে মেরে তবে নামে। যাই হোক, খাওয়ার পালা চুকলো এক সময়ে, তখন আবার সবাই গোল হয়ে বসলো ; নেংটিকে সবাই আরো কিছু বলবার জন্যে ধরাধরি করলে।

অ্যালিস বললে, "আমায় তোমার ইতিহাস শোনাবে বলেছিলে, মনে আছে তো ?" তার পর ফিস্‌ফিস্‌ করে আরো বললে, "বলেছিলে বে আর কু কেন তোমার ু'চক্ষের বিষ, সেই গল্প আমায় শোনাবে।" একটু একটু ভয় করছে, নেংটি আবার না চোটে যায়।

অ্যালিসের দিকে ফিরে ফোঁস করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে নেংটি বললে, "সে বড়ো করুণ কাহিনী, বড্ডো বড়ো, আগা থেকে গোড়া, মুড়ো থেকে ল্যাজা, অনেক লম্বা।"

নেংটির পেছন বাগে তাকিয়ে দেখে নিয়ে অ্যালিস বললে. "তা তো দেখতেই পাচ্ছো. ল্যাজটা তো তোমার বেশ লম্বাই বটে, কিন্তু তাতে দুঃখের কী আছে!" অ্যালিস তখনো ল্যাজের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, এদিকে নেংটি তার কাহিনী বলে চলেছে ; অ্যালিসের কল্পনায় তাই গল্পের চেহারাটা দাঁড়ালো এইরকম—

নেড়ি কুকুর করছিলো পায়চারি,
নেংটি দেখে ছুটে তাড়াতাড়ি,
দাঁত খিঁচিয়ে বললে এসে চোটে,
"তোর নামেতে নালিশ আছে
কোর্টে। এক্ষুনি এক ভীষণ
কঠিন মামলা করবো
দায়ের, এখন ঠ্যালা
সামলা! কোনো কথা
মানবো নাকো বারণ,
মামলা হবেই, সেটার
আসল কারণ—আজকে
আমার নেই কোনো
কাজকম্মো।" নেংটি
বলে, "মশাই, একী
ধম্মো! জজ নেইকো,
জুরীও নেই, তবে?
মামলা লড়া
পণ্ডশ্রই মহবে।"
স্যায়না কুকুর
বললে, "আমিই
জজ, আমিই
জুরী, করিস নে
গজ্ গজ্! আইন-
মাফিক দেখবো
সকল দিক,
করবো আমি
ন্যায়-বিচারই
ঠিক! মোকদ্দমার
রায় বেরোবে
বিচারে তোর
ফাঁসি
হবে!"

নেংটি অ্যালিসকে হঠাৎ ধমকে বলে উঠলো, "মোটেই মন দিচ্ছো না তুমি, কী ভাবছো ?"

অ্যালিস খুব কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "মাফ করো ভাই ; তুমি তো পাঁচ নম্বর বাঁকের কাছে এসে পৌঁছেছো, তাই না ?"

নেংটি চোটে উঠে বললে, "বাঁক নয়, গাঁট !"

অ্যালিস সর্বদাই লোকের উপকার করতে ভালোবাসে তো, তাই সাত-তাড়াতাড়ি বললে, "গাঁট ? গাঁট পড়ে গেছে তোমার ল্যাজে ? এসো না ভাই, খুলে দি !"

নেংটি বললে, "ও-সব কিছু হবে-টবে না", তার পর উঠে চলে যেতে যেতে বললে, "যতো সব আবোল-তাবোল কথাবার্তা বলে আমায় খালি খালি অপমান করা !"

অ্যালিস বেচারা কী আর করে, খুব বিনয় করে বললে, "আমি কিন্তু অপমান করবার জন্যে ও-কথা বলিনি। আর, তুমি বড্ডো একটুতেই চোটে যাও !"

উত্তরে নেংটি শুধু বিজ্ বিজ্ করতে লাগলো।

অ্যালিস পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে, "দয়া করে ফিরে এসো, ভাই, গল্পটা শেষ করে যাও !" তখন বাকি সব্বাই এক সঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ, ভাই, লক্ষ্মীটি ভাই !" নেংটি শুধু অস্থিরভাবে ঘন ঘন মাথা নাড়াতে লাগলো, আর, আরো তাড়াতাড়ি পা চালালে।

নেংটি চোখের আড়াল হতেই তোতা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, "আহা গো, থাকলো না, চলে গেলো।" এক কাঁকড়া-বুড়ি সেই ফাঁকে আবার তার মেয়েকে বলতে লাগলো, "দেখলে তো মা, শিখলে তো ? কখ্খনো মেজাজটি খারাপ করবে না।" কাঁকড়া-মেয়ে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলো, "থামো, মা, থামো, তোমায় দেখলে শামুক-ঝিনুকের পর্যন্ত পিত্তি চোটে যায়।"

কাউকে ঠিক শোনাবার জন্যে নয়, এমনিই অ্যালিস বলে উঠলো, "আহা, আমাদের ডাইনা এখানে থাকলে সত্যিই বড়ো ভালো হতো ; তা হলে এক্ষুনি নেংটিকে ফিরিয়ে আনতে পারতো গো।"

লরী বললে, "যদি অভয় দাও তো বলি, ডাইনাটি কে ?"

অ্যালিসের তো তার পোষা বেড়াল-টেড়ালের কথা বলতে ভালোই লাগে, তাই খুব আগ্রহ নিয়ে বলতে লাগলো, "ডাইনা হলো আমাদের

পোষা বেড়াল। ইঁদুর ধরতে যে কী ওস্তাদ, ধারণাই করতে পারবে না। ওঃ, আর পাখিদের পেছনে যে কী কাণ্ডই করে, একবার যদি দেখতে! পাখি চোখে পড়েছে কী আর রক্ষে নেই, ছোটোখাটো পাখি হলে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলবে!"

অ্যালিসের এই বক্তিমে শুনে পুরো দলটার মধ্যে একটা আশ্চর্য সাড়া পড়ে গেলো। কয়েকটা পাখি তো তক্ষুনি কেটে পড়লো; একটা ম্যাগপাই পাখি তার লম্বা ল্যাজ-ট্যাজ বেশ করে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে নিতে বিড়্ বিড়্ করে বললে, "নাঃ, এবার সত্যিই বাড়ি ফেরা দরকার; রাত্তিরের হাওয়াটা আবার আমার গলার পক্ষে বড়ো খারাপ!" একটা ক্যানারি পাখি তার ছানা-পোনাদের ডেকে কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, "আয় রে বাছারা, চলে আয়, তোদের ঘুমের সময় হলো!" নানান রকম সাফাই গেয়ে কেটে পড়তে লাগলো একের পর এক; অ্যালিস আবার সেই একলা।

দুঃখু করে অ্যালিস বললে, "ডাইনার কথাটা কেন যে তুললুম ছাই। এখানে কেউই তো দেখছি ওকে পছন্দ করে না, অথচ আমি জানি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো বেড়াল হচ্ছে ডাইনা! ডাইনা রে, আর কি তোর সঙ্গে দেখা হবে আমার?" বলতে বলতে আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো অ্যালিস—বড়ো একা একা লাগছে, বড্ডো দমে গেছে বেচারি। যাই হোক, খানিক বাদে কিছুটা তফাতে ফট্ ফট্ পায়ের শব্দ শুনে আকুল হয়ে চোখ তুলে দেখতে চেষ্টা করলে; মনে একটু আশা, হয়তো নেংটিভায়া মত পাল্টেছে, গল্পটা শেষ করতে ফিরে আসছে বোধ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খরগোশের গোলাম টিকটিকি

সেই সাদা খরগোশটা পটর-পটর করতে করতে ফিরে আসছে, আর চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী খুঁজছে, যেন হারিয়েছে কিছু। অ্যালিসের কানে গেলো, সে বিড়্‌বিড়্‌ করে বলছে, "ওরে বাব্বা, জমিদারগিন্নী! ওরে ব্বাবা! হায় রে আমার নরম থাবা, হায় রে আমার লোম, হায় রে আমার গোঁফ! জমিদারগিন্নী যে আমায় ফাঁসি দেবেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই, বনবেড়াল যেমন সাক্ষাৎ যম, তেমনি খাঁটি কথা! কোথায় যে ছাই ফেললুম জিনিসগুলো?" সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিস বুঝতে পারলে যে, সেই জাপানী হাত-পাখা আর দস্তানাজোড়ার জন্যেই খরগোশভায়ার এতো খোঁজাখুঁজি; তাই সেও ভাবলে, দেখা যাক-না, যদি খুঁজে পাই। সেও খুঁজতে লাগলো, কিন্তু কোত্থাও নেই—সেই পুকুরে সাঁতার-টাঁতার কাটবার পর থেকে সবকিছু কেমন বিলকুল পাল্‌টে গেছে, সেই বড়ো হল্‌ঘর, সেই কাঁচের টেবিল, সেই ছোট্টো দরজা—কিচ্ছুটি নেই, সব উবে গেছে।

মাথা নিচু করে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে খরগোশভায়ার চোখ পড়লো অ্যালিসের দিকে, ধমকের সুরে বললে, "ব্যাপারটা কী, মেরি-অ্যান! এখানে কী করছিস, অ্যাঁ? যা দিকিনি বাড়ি থেকে দৌড়ে একজোড়া দস্তানা আর-একটা হাত-পাখা নিয়ে আয় তো। যা,

যা, চট্ করে যা!" খরগোশভায়া যেদিকে আঙুল দেখালো, অ্যালিস ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে দৌড়তে লাগলো।

দৌড়তে দৌড়তে ভাবলে, নির্ঘাৎ ব্যাটা আমায় বাড়ির ঝি বলে ভুল করেছে। যখন টের পাবে, আসলে আমি কে, তখন কী চমকেই না যাবে! তবে, ওর দস্তানা আর হাত-পাখাটা বরং এনেই দেওয়া যাক, মানে, যদি অবশ্য যোগাড় হয়।' বলতে না বলতেই সুন্দর একটা ছোট্টো বাড়ির সামনে এসে পৌঁছে গেছে অ্যালিস, তার দরজায় ঝক্‌ঝকে পেতলের পাতের ওপর লেখা রয়েছে 'সা. খরগোশ'। কড়া-টড়া নাড়লে না, ভয় হল, পাছে সত্যিকার মেরি অ্যানের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যায়। সোজা উঠে গেলো ওপরে। কারণ মেরি অ্যানের সঙ্গে দেখা হলেই হয়তো তাকে ভাগিয়ে দেবে, দস্তানা আর হাত-পাখা খোঁজার সুযোগই পাবে না।

অ্যালিস নিজের মনেই বললে, 'কী মজার-ই না লাগছে, খরগোশের ফরমাশ খাটছি। এর পর ডাইনাও আমায় কাজে পাঠাবে হয়তো!' সেটা কেমন হবে, ভেবে দেখতে লাগলো অ্যালিস : 'মিস্ অ্যালিস! শিগ্‌গির চলে এসো, বেড়াতে যেতে হবে, তৈরি হয়ে নাও।' 'এক্ষুনি আসছি দিদিমনি!' কিন্তু ডাইনা যতক্ষণ না এসে পৌঁছোয় ততক্ষণ ইঁদুরের গর্তের দিকে নজর রাখতে হবে যে আমায়! ইঁদুরেগুলো যাতে বেরিয়ে না পালায়, দেখতে হবে যে! ডাইনা সত্যি সত্যি এইরকম হুকুম করে বেড়ালে, বাড়িতে বাড়িতে সবাই ওকে দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দেবে না তো?'

ইতিমধ্যে সে একটা সাজানো-গোছানো ছোট্টো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। সেখানে জানলার গায়ে একটা টেবিল, আর, টেবিলের ওপর (অ্যালিস এমনিই আশা করেছিলো মনে মনে) একটা হাত-পাখা আর দু-তিন জোড়া সাদা দস্তানা। পাখাটা আর এক জোড়া দস্তানা তুলে নিয়ে বেরোবার জন্যে দরজার দিকে এগোতে গিয়েই চোখে পড়লো আয়নার সামনে একটা ছোট্টো বোতল বসানো রয়েছে। এ বোতলটার গায়ে অবশ্য লেবেলে 'আমায় খাও'-টাও লেখা নেই। তা সত্ত্বেও অ্যালিস ছিপি খুলে বোতলটা মুখের মধ্যে উপুড় করে দিলে। মনে মনে বললে, 'কিছু খেলেই দেখা যাচ্ছে উদ্ভট কিছু একটা ঘটবেই, কাজেই দেখতে চাই, ইনি আবার কী ক্যারদানি দেখান। ভগবান করুন, যেন আবার লম্বা হয়ে যাই, কারণ পুঁচকে থাকতে থাকতে

এলে গেছি একেবারে !

ভগবান ঠিক তাই-ই করলেন, অ্যালিস যতটা সময় লাগবে বলে ভেবেছিলো তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়িই করলেন। বোতলের অর্ধেকটা সাবাড় করবার আগেই তার মাথাটা ছাদে গিয়ে ঠেকেছে, ঘাড় মট্‌কে যাবার ভয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলতে হলো। বোতলটা ঠক্ করে মাটিতে নামিয়ে রেখে বললে, "খুব হয়েছে, আর দরকার নেই বাবা—আশা করি আর বাড়বো না—এর মধ্যে এমন বেড়ে গেছি যে, দরজা গলে বেরবার তো উপায় রইলো না—নাঃ, চট্‌ করে অতটা না-খেলেই ভালো ছিলো !"



কিন্তু, হায় রে হায়। এখন আর সে কথা ভেবে কোনো লাভ নেই। বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে, দেখতে না দেখতে এতো লম্বা হয়ে গেলো যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে হলো ! মিনিট খানেকের মধ্যে যখন এমন অবস্থা হলো যে বসে থাকাও আর সম্ভব নয়, তখন একটা হাতের কনুই দরজায় গুঁজে আর-একটা হাত মাথায় জড়িয়ে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু, তখনো তার বাড়ের শেষ হলো না। শেষ পর্যন্ত একটা হাত সে জানলা দিয়ে বাইরে বার করে দিলে আর-একটা পা গলিয়ে দিলে

চিম্‌নির ফোঁকরের মধ্যে। বললে, "ব্যস, আর কিচ্ছু করবার নেই আমার, এখন যাই হোক আর তাই হোক। কী হবে রে বাবা শেষ পর্যন্ত।"

ভাগ্য ভালো, বোতলের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে, এর পর আর সে বাড়লো না। তা যেন হলো, কিন্তু, এ কী বদখত অবস্থা। যখন বুঝলে যে, এখান থেকে বেরোবার কোনো উপায়ই নেই, তখন বেচারি মুষড়ে পড়বে না তো আর কী হবে।

অ্যালিস ভাবতে লাগলো, 'বাড়িতে অনেক ভালো ছিলাম; খালি খালি বড়ো হওয়া নেই, খালি খালি ছোটো হওয়া নেই, ইঁদুর আর খরগোশের হুকুম তামিল করার ঝামেলা নেই। এখন একটু একটু মনে হচ্ছে, খরগোশের গর্তে না ঢুকলেই বোধ হয় ভালো হতো—কিন্তু—তবু—ভেবে দ্যাখো, এইরকম সব মজার কাণ্ড-কারখানা, মন্দ লাগে না! কী যে হলো আমার, ঠিক ধরা যাচ্ছে না। যখন রূপকথার গল্প পড়তাম, মনে হতো, ও-সব সত্যি সত্যি হয় না, আর এখন তো দেখছি নিজেই রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি। আমায় নিয়ে একটা বই লেখা উচিত, নিশ্চয়ই উচিত। যখন বড়ো হবো, নিজেই একটা বই লিখে ফেলবো—কিন্তু বড়ো হতে আর বাকি কী'—এবার গলায় দুঃখু মেশানো—'অন্তত এখানে তো আর বড়ো হওয়ার জায়গাই নেই মোটে।"

আবার ভাবলে, 'তার, মানে কি, আর আমি একটুও বড়ো হবো না? এক দিক থেকে অবশ্য সুখের কথা—বুড়ি হবো না কোনো কালে—কিন্তু, তার মানে তো পড়া মুখস্থ করার পালাও শেষ হবে না কোনোদিন। ওরে বাবা, সে আমার সইবে না।"

নিজের কথার উত্তর দিয়ে নিজেই বললে, "ওরে হাঁদা গঙ্গারাম অ্যালিস, এখানে পড়াশুনো করবি কী করে রে, বোকা মেয়ে? তোর নিজের জায়গাই কুলোয় না, বইপত্তর রাখবি কোথায়।"

এইভাবে নিজেই প্রশ্ন তোলে, নিজেই তার জবাব দেয়; বেশ রীতিমতো কথাবার্তাই চলতে থাকে কিছুক্ষণ। তার পর ঘরের বাইরে কার যেন গলা শোনা যেতে, বক্‌বকানি থামিয়ে অ্যালিস কান খাড়া করলে।

আওয়াজ এলো, "মেরি অ্যান! ও মেরি অ্যান। এক্ষুনি দস্তানা-

জোড়া এনে দে আমায়।" তার পর সিঁড়িতে প্যাটর-প্যাটর পায়ের শব্দ শোনা গেলো। অ্যালিস বুঝলে, সাদা খরগোশমশাই আসছেন তারই খোঁজ করতে। ভুলেই গেলো যে, এখন সে খরগোশটার চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বড়ো, ভয় পাবার কিছু নেই; সারা শরীর এমন ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো যে, পুরো বাড়িটাই নড়বড় করে উঠলো।

ততক্ষণে খরগোশভায়া দরজার গোড়ায় এসে পৌঁছে গেছে, দরজাটা খোলবার চেষ্টা করছে; কিন্তু দরজাটা তো ভেতর দিকে খোলে, আর অ্যালিসের কনুইটা সেখানে চেপে বসে আছে, কাজেই হাজার চেষ্টাতেও খোলা গেলো না। শোনা গেলো, বিড়বিড় করে খরগোশটা বলছে, "তা হলে না হয় ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে জানলা দিয়েই ঢুকি।"

'সে গুড়ে বালি', মনে মনে বললে অ্যালিস, তার পর যখন মনে হলো ঠিক জানলার নিচেই খরগোশটার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তখন হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বাতাসে একটা খামচা মারলে। কিছুই ধরতে পারলে না, কিন্তু একটা ভয়-পাওয়া চিৎকার শোনা গেলো, আর তার সঙ্গে পড়ে যাবার শব্দ, আর ঝন্‌ঝন্‌ করে কাঁচ ভাঙবার আওয়াজ। অ্যালিস বুঝলে, খরগোশটা কোনোও শার্সি-টার্সির ওপর পড়ে গেছে নিশ্চয়ই।

তারপরেই শোনা গেলো রাগের গলায় খরগোশটা চেঁচাচ্ছে, "প্যাট্‌। প্যাট্‌। কোথায় গেলি?" তার পরেই একটা অচেনা নতুন গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো, "এই যে আমি এখানে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আপেল তুলছি হজুর!"

খরগোশটা রেগে কাঁই হয়ে বললে, "আপেল তুলছো তো মাথা কিনছো! এদিকে এসো, আমায় এখান থেকে টেনে তোলো দিকিনি!" (এইখানে আরো কিছু কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো।)

"এবার বল্‌ তো প্যাট, জানলায় ওটা কী?"

"একটা হাত হজুর, নিচ্চয়ই একটা হাত!" (সে 'নিশ্চয়ই'কে বললে 'নিচ্চয়ই'।)

"বুদ্ধু কোথাকার, ওটা হাত? অতো বড়ো হাত কেউ কখনো দেখেছে কোনোদিন? পুরো জানলাটা জুড়ে রয়েছে একেবারে!"

"তা তো রয়েছেই, হজুর, কিন্তু তা হলেও ওটা হাত-ই বটে!"

"তা সে যাই-ই হোক, এখানেই-বা ওটা মরতে জুটেছে কেন? যা, গিয়ে সরিয়ে দে ওখান থেকে।"

এরপর অনেকক্ষণ কোনো সাড়া-শব্দ নেই, মাঝে-মধ্যে অ্যালিস শুধু টুকরো-টুকরো ফিস্‌ফিস্‌ শুনতে পেলে, "বটেই তো, বটেই তো হুজুর, আমার তো মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না, একদম নয়!" "ভীতুর রাজা কোথাকার, যা বললুম কর না!" শুনতে শুনতে অ্যালিস আবার একবার হাতটা বাড়িয়ে বাতাসে খাম্‌চা মারলে। এবারে দু'টো চিৎকার শোনা গেল, আর, আরো বেশি কাঁচ ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌। অ্যালিস ভাবলে, 'এদের বাড়িতে কতো কাঁচের শার্সিই আছে রে বাবা! এবার ওরা কী করবে, কে জানে। জানলা দিয়ে আমায় টেনে বার করবে! পারলে তো ভালোই হত! এখানে তার এক দণ্ডও তিষ্ঠোতে পারা যাচ্ছে না!'

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলে, কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। শেষকালে আরো কিছুক্ষণ পরে চলন্ত গাড়ির চাকার ঘড়ঘড়ানি কানে এল, আর সেইসঙ্গে অনেক লোকের একসঙ্গে কথা বলার আওয়াজ। যেটুকু বোঝা গেল: "আর-একটা মই কোথায় গেল?—সে কী! আমার তো একটাই আনবার কথা; বিল্‌-এর কাছে আর-একটা আছে—বিল্‌! এদিকে নিয়ে এস তো ছোক্‌রা!—হ্যাঁ, এই তো, এই কোণে দাঁড় করিয়ে দাও তো—আহা, না, না, আগে দু'টোকে একসঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নাও—এই সেরেছে তাতেও আদ্দেক পর্যন্তও পৌঁছচ্ছে না যে—আঃ, ওতেই হবে! অত খুঁতখুঁত করলে চলে না—এই যে, বিল্‌! দড়িগাছা পাকড়ে ধর তো—ছাদে ওর ভর সইলে হয়!—সাবধান, ওখানকার টালিটা আলগা—ঐ রে খসে পড়ল—মাথা নিচু কর, মাথা নিচু কর!" (দুম্‌ করে জোর শব্দ।) "কাণ্ডটা করলে কে, অ্যাঁ?—আমার তো মনে হয় বিল্‌-ই করেছে—তা হলে চিমনি দিয়ে গলে ঘরের মধ্যে ঢুকছে কে!—না না, এ কাজ আমি পারব না!—পারতেই হবে তোমাকে!—তা হলে, পারলেও আমি করব না!—বিল্‌কেই যেতে হবে—এই যে, বিল্‌! তোমার মনিব বলেছেন, তোমাকেই চিমনির মধ্যে সেঁধিয়ে ঘরের মধ্যে নামতে হবে!"

অ্যালিস আপন মনে বললে, 'ও! দেখা যাচ্ছে, বিল্‌ তা হলে চিমনির মধ্যে দিয়ে আসছে এখানে! সব দায়িত্বই তো এরা বিল্‌-এর

কাঁধে চাপাচ্ছে দেখছি! না, বাবা, হাজার টাকা দিলেও, আমি বিল্ হতে রাজি নই! আমার একটা পা তো চিমনির তলায় চুল্লীর মধ্যে ঢোকানই রয়েছে! খুব ঘুপসি, বেশি জায়গা নেই অবশ্য! তবে মনে হচ্ছে, পা দিয়ে ছোটোখাটো একটা ঠোক্কর মারতে পারব।'

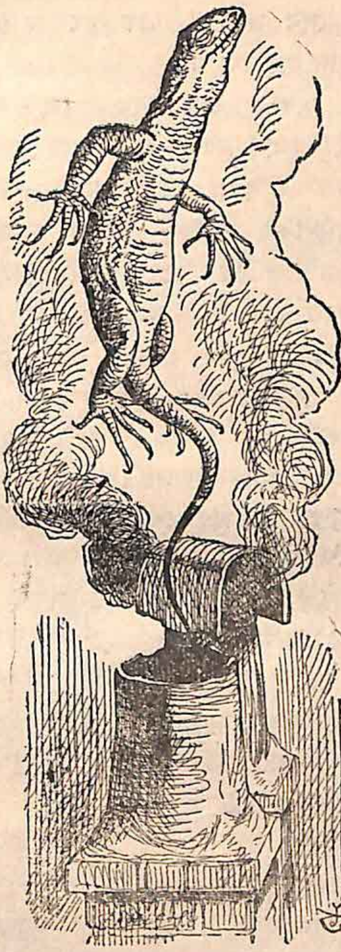
চিমনির তলায় যতটা পারলে পা'টা গুটিয়ে নামিয়ে আনলে অ্যালিস, তার পর চুপচাপ থাকতে থাকতে টের পেলে, ঠিক তার পায়ের ওপরেই চিমনির মধ্যে কী যেন একটা জীব (ধারণা করতে পারলে না, কী ধরনের হতে পারে।) নখ দিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করছে। অ্যালিস মনে মনে বললে, 'এই হল বিল্,' বলেই ধাঁই করে একটা লাথি ছুঁড়লে, তার পর চুপ করে পড়ে রইল—দেখা যাক ব্যাপারটা কদ্দূর গড়ায়।

এর পর প্রথম যা শোনা গেল, তা হল একসঙ্গে অনেক গলার চিৎকার, "ঐ যে, ঐ যে, বিল্‌কে দেখা যাচ্ছে, ওপরে উঠে যাচ্ছে!" তারপর শুধু খরগোশটার গলা, "ওহে, ঐ যে ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে আছ, বিল্‌কে লুফে নাও!" তার পর আবার সব একদম চুপচাপ। তারও পরে আবার নানান জনের কথা বলার গোলমাল— "মাথাটা তুলে ধর, তুলে ধর—হ্যাঁ, এবারে একটু ব্রাণ্ডি দাও— আহা-হা, দেখ, একেবারে দম আটকে দিও না—এই যে, বল তো বাছা, ব্যাপারটা কী ঘটল? কী হয়েছিল তোমার? সব খুলে বল তো আমাদের!"

শেষ-মেশ অতি ক্ষীণ গলায় চিঁচিঁ করে কে যেন বললে (অ্যালিস বুঝলে, এটা বিল্-এর গলা), "কী যে হল, কিছুই জানি না—থাক, আর দেবেন না, ধন্যবাদ। এখন একটু ভালোই লাগছে—কিন্তু মাথার মধ্যে কেমন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, গুছিয়ে বলতে পারব না—যেটুকু টের পেলুম, কী যেন একটা ইস্পিরিং-এর মতো ঠাঁই করে আমার ওপর এসে ঠোক্কর লাগল, আর আমি যেন হাউইয়ের মতো সাঁ করে আকাশে উড়ে গেলাম।"

সবাই বললে, "সত্যিই তাই গিয়েছিলে, বাছা!"

খরগোশের গলা শোনা গেল, "বাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিতে হবে।" অ্যালিস তাই শুনে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "তা যদি কর, তা হলে নির্ঘাৎ ডাইনাকে লেলিয়ে দেব তোমার পেছনে!"



সঙ্গে সঙ্গে সব চুপচাপ, টুঁ শব্দটি নেই। অ্যালিসের ভাবনা শুরু হল, 'এবার ওরা কী করবে। ঘটে যদি একরত্তি বুদ্ধি থাকে, তা হলে ছাদটা খুলে ফেলবে।' দু-এক মিনিট বাদে আবার ওদের নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল, অ্যালিস শুনতে পেলে খরগোশটা বলছে, "একগাড়ি হলেই চলে যাবে, আরম্ভ তো করা যাক।"

অ্যালিস ভাবলে, 'একগাড়ি কী?' বেশিক্ষণ অবশ্য ভাবতে হল না, পর মুহূর্তেই জানলায় খটাখট ঢিল পড়তে লাগল, দু-একটা জানলা দিয়ে অ্যালিসের মুখে এসেও লাগল। অ্যালিস ভাবলে, 'নাঃ, এ তো থামান দরকার।' তার পর চেঁচিয়ে বললে, "খবরদার বলছি, ফের যদি

এমন কর, বুঝিয়ে দেব মজা।" এর ফলে আবার একবার সাড়াশব্দ থেমে গিয়ে সব চুপচাপ হয়ে গেল।

অ্যালিস একটু অবাক হয়ে দেখলে যে, ঘরের মেঝেয় পড়ে ঢিলগুলো সব ছোট্টো-ছোট্টো কেক হয়ে গেছে; দেখে, তার মাথায় একটা মতলব এল। ভাবলে, 'এই থেকে একটা কেক যদি খাই তা হলে নিশ্চয়ই আমার কিছু-না-কিছু একটা হবেই; আর এর চেয়ে বেশি বড়ো হওয়া যখন আর সম্ভব নয়, তখন ছোটোই হব মনে হচ্ছে।'

একটা কেক তুলে গালে ফেলতেই খুশী হয়ে দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে হুস হুস করে সে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। যেই না সেই ঘরের দরজা দিয়ে গলবার মতো ছোটো হয়েছে, আর দেখা-শোনা নয়, চোঁ চোঁ দৌড় দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে বাইরে। এসে দেখে, বাইরে ছোটো-ছোটো পাখি-টাখি আর জানোয়ারদের বেশ বড়োসড়ো একটা ভিড় জমে গেছে। ভিড়ের মাঝখানে রয়েছে বেচারি টিকটিকিটা—সেই বিল্—দু'টো গিনিপিগ তাকে তুলে ধরে রেখেছে, আর বোতল থেকে কী যেন খাওয়াচ্ছে। অ্যালিসকে দেখতে পাওয়া মাত্র সবাই হুড়মুড় করে তেড়ে এল তার দিকে; কিন্তু অ্যালিস প্রাণপণে দৌড় লাগিয়ে এসে পৌঁছল একটা বনের মধ্যে, ওদের নাগালের একদম বাইরে।

বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অ্যালিস ভাবছে, 'সব চেয়ে আগে দরকার নিজের ঠিক আসল মাপটা ফিরে পাওয়া, আর তারপর দরকার, সেই সুন্দর বাগানে যাবার রাস্তাটা খুঁজে বার করা। এইটাই মনে হচ্ছে সব চেয়ে ভালো মতলব।'

মতলবটা তো ভালোই, বেশ পরিষ্কার, ঝামেলা নেই, কিন্তু একটিমাত্র মুশ্কিল হল, সেটা হাসিল করতে গেলে কী করা দরকার, সে সম্বন্ধে এক ফোঁটাও ধারণা নেই যে তার! গাছপালার ফাঁকে যখন উঁকিঝুঁকি মারছে, হঠাৎ মাথার ওপর চড়া গলার ঘেউ ঘেউ ডাক শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় উঁচু করে ওপর দিকে তাকালে।

একটা বিরাট কুকুরছানা মুখ নিচু করে গোল-গাল চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর খুব সন্তর্পণে একটা থাবা বাড়িয়ে তাকে ছোঁবার চেষ্টা করছে। সোহাগ-মেশান গলায় অ্যালিস বললে, "আহা, ছোটো সোনামণি রে," আর, শিস দিয়ে তাকে কাছে ডাকবার চেষ্টা করলে; অবশ্য মনে মনে ভয়ও পাচ্ছে, কুকুরটার খিদে

পায়নি তো! পেলেই তো চিত্তির, যতই সোহাগ জানাক, অ্যালিসকে খেয়ে খিদে মেটান মোটেই অসম্ভব নয়।

খানিকটা নিজের অজান্তেই অ্যালিস কখন একটা গাছের ভাঙা ডাল তুলে নিয়ে কুকুরটার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে, আর কুকুরটাও তাই না দেখে চার পা তুলে লাফ দিয়ে, আনন্দে কেঁউ কেঁউ শব্দ করে ডালটার দিকে এগিয়ে এসে মিছিমিছি করে সেটাকে কামড়াতে শুরু করে দিয়েছে;



অ্যালিস তখন তার পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার ভয়ে একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর আবার যখন ঝোপের ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে এল, দেখলে, কুকুরছানাটা তাড়াহুড়ো করে গাছের ডালটা ধরতে গিয়ে একেবারে চার পা তুলে উল্টে পড়েছে। তখন অ্যালিস ভাবলে, এ একেবারে চাকা-লাগান কাঠের ঘোড়ার মতো অবস্থা। কুকুরটা

যেরকম করছে, কখন না-জানি তার পায়ের নিচে পড়ে যায়, সেই ভয়ে অ্যালিস আবার ঝোপটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। কুকুরছানাটা বার বার তেড়ে আসতে লাগল ডালটার দিকে; প্রত্যেকবার একটু একটু ক'রে আরো কাছাকাছি এসে থামছে, আর তেড়ে আসবার জন্যে আরো বেশি ক'রে পেছোচ্ছে, সমানে হেঁড়ে গলায় ঘেউ ঘেউ করে চলেছে; শেষ পর্যন্ত বেশ খানিকটা তফাতে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বসে পড়েছে, জিভটা মুখের বাইরে ঝুলিয়ে দিয়েছে, আর গোল-গোল চোখ দু'টো আধ-বোজা করে ফেলেছে।

অ্যালিস দেখলে, সট্‌কাবার এমন সুযোগ আর হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগালে, আর যখন পা ভেঙে এল, দম ফুরিয়ে গেল, কুকুরের ডাক দূর থেকে খুব আবছা শোনাতে লাগল—তখন থামলে।

"তবু বলব বাপু, কুকুরছানাটা কিন্তু কী মিষ্টি!" বলতে বলতে অ্যালিস একটা বাটারকাপ ফুলের গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল, গাছের একটা পাতা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেতে শুরু করলো। "কুকুরছানাটাকে কিছু খেলা শেখালে হতো, কিন্তু, ওকে শেখাতে গেলে শরীরটা যে-মাপের হওয়া দরকার, তা না-হলে তো—ওঃ, ভগবান! একটু হলে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমায় তো আবার বড়ো হতে হবে! কী করে হব, ভেবেচিন্তে দেখা যাক। মনে হচ্ছে কিছু একটা গিলতে হবে আমায়; কিন্তু, সমস্যাটা তো রয়েই গেল—গিলবটা কী?"

সত্যিই, খুব বিরাট সমস্যা—কী গিলবে? অ্যালিস চারিপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—ফুল, ঘাসের শীষ, এমন কিছু চোখে পড়ল না, যা খাওয়া চলে তখনকার মতো। তার কাছেই একটা বিরাট ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, প্রায় তারই মাথার সমানে উঁচু। অ্যালিস তার তলা দেখলো, এপাশ দেখলো, ওপাশ দেখলো, পেছনদিক দেখলো, কিছুই যখন চোখে পড়ল না, তখন ভাবলে ওপরটাও একবার দেখা যাক, যদি কিছু থাকে।

ডিঙি মেরে টান টান হয়ে ছাতাটার কিনারা থেকে ওপরটায় উঁকি মারতেই অ্যালিস দেখতে পেলে, ছাতার ওপর বসে রয়েছে বেশ গোব্দা একটা নীল রঙের শোঁয়াপোকা। হাত মুড়ে বসে আছে, খুব শান্ত হয়ে লম্বা নল মুখে দিয়ে গড়গড়া টানছে—অ্যালিসের দিকে বা অন্য কোনো কিছুরই দিকে তার গেরাহ্যিই নেই মোটে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুঁয়াপোকার উপদেশ

শোঁয়াপোকা আর অ্যালিস, দু'জনে দু'জনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ; তারপর গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে ঘুম জড়ান আল্সে গলায় শোঁয়াপোকা অ্যালিসকে বললে, "তুমি কে বট হে?"

আলাপ শুরু করার পক্ষে কথাটা খুব মনের মতো নয়। অ্যালিস একটু আমতা আমতা করেই উত্তর করলে, "আমি—আমি নিজেই ঠিক জানি না, আজ্ঞে, যে, এখন আমি ঠিক কে। আজ সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেছিলুম, তখন আমি কে ছিলুম তা জানি, কিন্তু, তারপর থেকে কত বারই যে বদলালুম!"

শোঁয়াপোকা এবার কড়া সুরে বললে, "তার মানেটা কী? বুঝিয়ে বল।"

অ্যালিস বললে, "আমার কথা আমি কী করে বোঝাই বলুন, আমি তো আর আমি নেই, জানেন!"

শোঁয়াপোকা বললে, "না, জানি না!"

খুব বিনয় করে অ্যালিস বললে, "এর চেয়ে বেশি গুছিয়ে বলার সাধ্যি নেই আমার, কী করব বলুন। প্রথম কথা হল, আমি নিজেই ঠিক বুঝতে পারছি না! দিনের মধ্যে এত বার রকম রকম

মাপ হয়ে যাওয়াটা বড্ডো গোলমেলে ব্যাপার।"

শোঁয়াপোকা বললে, "না, নয়।"

অ্যালিস বললে, "এখনো আপনার কপালে সেরকম ব্যাপার ঘটেনি বলেই বলছেন, কিন্তু যখন একদিন গুটিপোকা হয়ে যাবেন—যেতেই হবে একদিন-না-একদিন—আর, তার পরে যখন আবার প্রজাপতি হয়ে যাবেন, তখন কেমন অদ্ভুত লাগবে দেখবেন, লাগবে না?"

শোঁয়াপোকা বললে, "মোটেই না।"



অ্যালিস বললে, "হবে হয়তো, আপনার মন অন্যরকম। তবে আমি জানি, খুব অবাক লাগবে আমার।"

শোঁয়াপোকাটা বেশ অবজ্ঞার সুরেই বললে, "তোমার ? কেই-বা তুমি ?"

তার মানে আবার আলাপের সেই শুরুতে ফিরে এল ওরা। শোঁয়াপোকার ঐরকম কাটা-কাটা কথায় অ্যালিস ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছিল, এবারে রুখে উঠে বললে, "আমার মতে, আপনারই এবার বলার পালা, আপনি কে ?"

শোঁয়াপোকা বললে, "কেন ?"

আবার সেই ধাঁধা-লাগান প্রশ্ন ; অ্যালিস লাগসই কোনো জবাব খুঁজে পেলে না, তার ওপর শোঁয়াপোকার মেজাজটাও বিশেষ সুবিধের নয় দেখে অ্যালিস চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

শোঁয়াপোকা পেছন থেকে হাঁক পাড়লে, "ফিরে এস, একটা দরকারী কথা আছে।"

একটা তবু আশার কথা শোনা গেল ! অ্যালিস ফিরে এল।

শোঁয়াপোকা বললে, "মাথা গরম করো না।"

কোনোরকমে রাগ চেপে রেখে অ্যালিস বললে, "ব্যস্, শুধু এই ?"

শোঁয়াপোকা বললে, "না।"

অ্যালিস ভাবলে, 'কিছু তো করবার নেই, অপেক্ষা করেই দেখা যাক, বলা যায় না, হয়তো দরকারী কথা কিছু শোনাতে পারে।' শোঁয়াপোকাটা কয়েক মিনিট গড়গড়া টানলে আর ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়লে, তার পর মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা আবার নামিয়ে রেখে বললে, "বেশ, তোমার তা হলে মনে হচ্ছে যে, তুমি বদলে গেছ, তাই তো ?"

অ্যালিস বললে "আজ্ঞে হ্যাঁ, দুঃখের কথা কী আর বলি, তাই তো গেছি বলে মনে হয়। আগের মতো কিছুই আর মনে করে রাখতে পারছি না—আর, দশ মিনিটও এক মাপের থাকছি না আমি !"

শোঁয়াপোকা বললে "কী মনে রাখতে পারছ না ?"

অ্যালিস কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, "দেখুন না, বলতে গেলুম 'আহা, কেমন ব্যস্ত ছোটো মৌমাছি,' কিন্তু কবিতার সব কথা অন্য-রকম হয়ে গেল !"

শোঁয়াপোকা বললে, "সেই 'বুড়োর কবিতা'টা বল তো দেখি !"



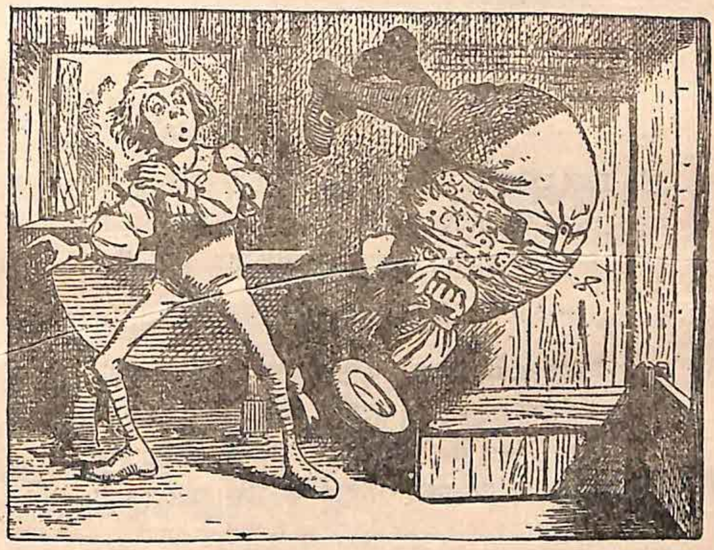
অ্যালিস হাতের ওপর হাত রেখে শুরু করলে—

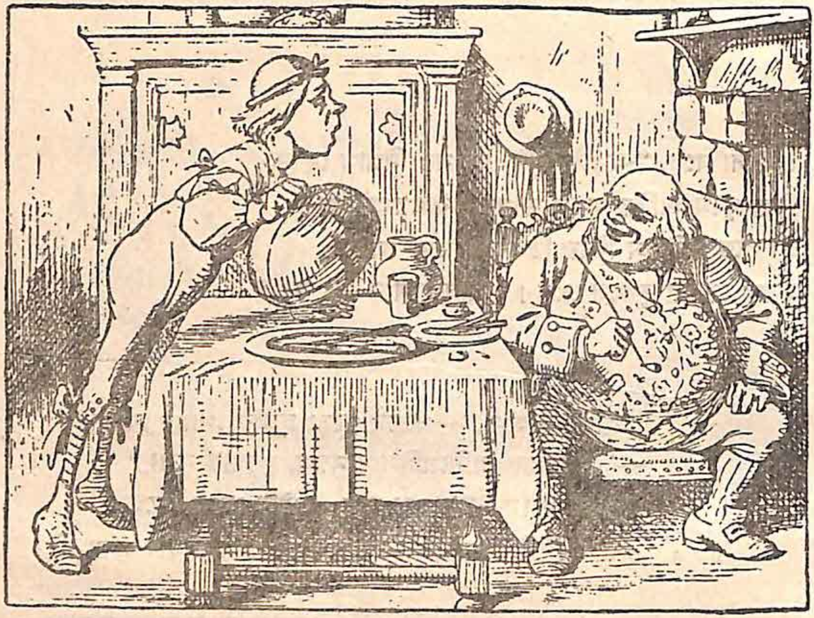
ভাইপো বলে, "খুড়ো, তোমার বয়েস হল ঢের,
টাকটি ছাড়া পাকা চুলে সারা মাথাই ভরা,
ঠ্যাং উঠিয়ে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছ ফের,
ব্যাপারটা কী? এই বয়েসে উচিত এমন করা?"

বললে খুড়ো, "যখন আমার বয়েস ছিল কম,
ভয় পেয়েছি, হয়তো তাতে মগজ হবে মাটি।
এখন আমি উলটোবাগে থাকি যে হরদম,
কারণ, আমার মগজই নেই, টের পেয়েছি খাঁটি।

ভাইপো বলে, "বুড়োই তুমি, তা নয় দিলাম ছেড়ে,
কিন্তু তুমি হাতির মতন ভীষণ রকম মোট্‌কা।
তা সত্ত্বেও পিছন ফিরে ডিগবাজি এক মেরে
ঘরের ভেতর ঢুকলে এসে! লাগছে মনে খট্‌কা।"

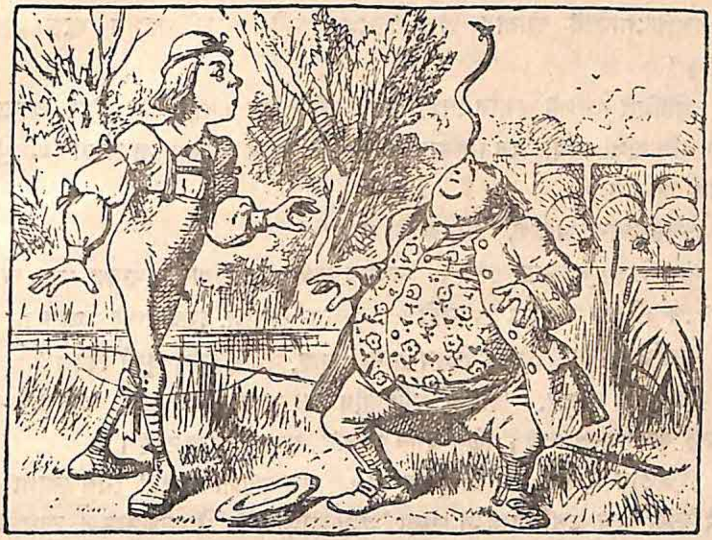
"ছোটো বেলায়,"—বললে খুড়ো চুলের গোছা ঝেঁকে,
—'দেহটাকে বানিয়েছিলাম নরম, তুলোর বস্তা,
এই যে মলম—দু'পয়সা দাম—এইটা মেখে মেখে।
দু-এক শিশি কিনবি না-কি? দাম তো নেহাৎ সস্তা!"





"চোয়াল তোমার কম-জোর, খুড়ো, চিবোবার নেই ভরসা,
চর্বি ছাড়া তো আর সব কিছু শক্ত তোমার পক্ষে,
গোটা হাঁসটাকে সাবড়ালে তবু, হাড়, ঠোঁট সব ফর্সা।
কোন্ কায়দায় সামলালে, বল্ল. অনুরোধ কর রক্ষে।"

"বিয়ের পরেই তোদের খুড়িমা হরদম দিত বাগ্ড়া,
ঝগড়া মেটাতে নালিশ করেছি, কোর্টে নিয়ে গেছি ঠেলে।
মামলা লড়তে বকবক করে চোয়াল হয়েছে তাগ্ড়া,
বাকি জীবনটা তারই দৌলতে কাটাচ্ছি অবহেলে।"



ভাইপো তখন বললে খুড়োয়, "বুড়ো বয়েসের ধারা—
নির্ঘাত জানি, এখন তোমার দু'চোখে পড়েছে ছানি।
তবু অনায়াসে নাকের ডগায় বান মাছ রাখ খাড়া,
এমন কায়দা শিখলে কোথায়? দেখে যে অবাক মানি!"

"তিনবার তোর প্রশ্নের সাফ জবাব দিয়েছি আগে,
জ্যাঠামি-পাকামি অনেক হয়েছে, মুরুব্বিপনা রাখ্‌তো!
তুই কি ভাবিস, দিনরাত ঐ ঘ্যান্ ঘ্যান্ ভালো লাগে?
এক লাথি মেরে ফেলে দেব ঠেলে! ভালোয় ভালোয়
ভাগ্ তো!"

শোঁয়াপোকা বললে, "ঠিক হয়নি।"

অ্যালিস মিউ মিউ করে বললে, "সত্যিই সবটা ঠিক হল না, কয়েকটা কথা অন্যরকম হয়ে গেল।"

শোঁয়াপোকা সাফ জবাব দিলে, "আগাগোড়া সমস্তটাই ভুল।" তার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

শোঁয়াপোকাই আবার শুরু করলে, "কী রকম মাপের হতে চাও তুমি ?"

অ্যালিস ঝটপট জবাব দেয়, "ঠিক কী রকম মাপ, সেটা নিয়ে আমার তত মাথাব্যথা নেই, তবে কি-না, খালি খালি মাপ বদল হলে বড়ো বিচ্ছিরি লাগে, জানেন ?"

শোঁয়াপোকা বললে, "না, জানি না।"

অ্যালিস চুপ করে গেল। কথায় কথায় এতবার কেবল 'না' আর 'না' সে জীবনে কখনো শোনেনি। বুঝতে পারলে, মেজাজটা চড়ছে।

শোঁয়াপোকা বললে, "এখন যেমন আছ, তাতে তুমি খুশী তো ?"

অ্যালিস বললে, "আজ্ঞে, যদি রাগ না করেন তো বলি, আর সামান্য একটু বড়ো হতে চাই ; তিন ইঞ্চি মাপটা বড্ডো যাচ্ছেতাই।"

"অত্যন্ত সুন্দর, ভারি সুন্দর মাপ, খুব ভালো মাপ," বেশ রেগেমেগে এই কথা বলে শোঁয়াপোকা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। (দেখা গেল, তার মাপ একেবারে ঠিক ঠিক তিন ইঞ্চি।)

অ্যালিস বেচারি করুণ গলায় বললে, "কিন্তু তিন ইঞ্চি মাপে আমার অভ্যেস নেই যে!" মনে মনে ভাবলে, 'কথায় কথায় এরা বড়ো চোটে যায়।'

"ক্রমশ অভ্যেস হয়ে যাবে," এই কথা বলে শোঁয়াপোকা আবার গড়গড়ার নলটা মুখে গুঁজে নিয়ে ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

অ্যালিস দেখলে, ও যতক্ষণ না আবার কথা বলে, ততক্ষণ চুপ করে থাকাই ভালো। দু-এক মিনিট পরে শোঁয়াপোকা গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে রাখলে, কয়েক বার হাই তুললে, তার পর আড়ামোড়া ভাঙলে। তার পর ব্যাঙের ছাতা বেয়ে নিচে নেমে সুড়্‌সুড়্‌ করে ঘাসের মধ্যে দিয়ে গুটিগুটি যেতে যেতে বললে, "একটা দিকে লম্বা হবে, আর-একটা দিকে ছোটো হবে।"

অ্যালিস ভাবলে, 'কিসের একটা দিক, কিসেরই-বা আর-একটা দিক ?'

অ্যালিসের মনের কথা শুনতে পেয়েই যেন শোঁয়াপোকাটা বললে, "ঐ ব্যাঙের ছাতার।" আর, তার পরেই সে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

অ্যালিস সেই ব্যাঙের ছাতাটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবে বার করতে

চেষ্টা করতে লাগল, ছাতাটার এদিকই-বা কোন্‌টা আর ওদিকই-বা কোন্‌টা। ছাতাটা একেবারে ছাতার মতোই গোল, কাজেই বুঝতে পারলে, বড়োই মুশ্‌কিলের ব্যাপার। যাই হোক, অনেক ভেবেচিন্তে শেষকালে ছাতাটাকে বেড় দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে যদ্দূর যায়, তার পর দু'হাতে দু'টো টুক্‌রো ভেঙে নিলে।

এখন চিন্তা হল, কোন্ দিকটায় কী হবে। তার পর ডান হাতের টুকরোয় একটা কামড় দিয়ে দেখতে লাগল, কী হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে তার থুৎনিটা সজোরে ঠকাস করে ঠুকে গেল কিসের সঙ্গে—সেটা তার নিজেরই পায়ের পাতা।

এইরকম হঠাৎ এতখানি বদল হতে দেখে অ্যালিসের খুব ভয় হল, তবে বুঝতে পারলে যে, সময় নষ্ট করা মোটেই চলবে না, হু হু করে ছোটো হয়ে যাচ্ছে; কাজেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের টুকরোটাতে চট করে একটা কামড় দিতে গেল। থুৎনিটা এমন চেপে বসে আছে পায়ের পাতার ওপর যে, ভালো করে হাঁ করতেও পারা যাচ্ছে না, তবু যা হোক করে সামান্য একটুখানি মুখে পুরে দিলে।

"যাক্ বাবা, বাঁচা গেল। মাথাটা শেষ অবধি আলগা হয়েছে।" খুব খুশী হয়েই বললে অ্যালিস, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল—তার কাঁধ দু'টোকে মোটেই দেখা যাচ্ছে না। নিচের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ছে কেবল বিরাট লম্বা একখানা গলা। আরো নিচে খালি সবুজ আর সবুজ, আর তার মধ্যে থেকে সেই বিরাট লম্বা গলাটা ডাঁটার মতো ওপর দিকে উঠে এসেছে।

অ্যালিস মনে মনে বললে, 'ঐ-সব সবুজ সবুজ জিনিসগুলো কী হতে পারে? আর আমার কাঁধদু'টোই-বা গেল কোথায়? আর, ওরে আমার হাত রে, তোদের যে দেখতেই পাচ্ছি না।' বলতে বলতে সে হাত দু'টো নাড়িয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি, শুধু অনেক-অনেক নিচের সেই সবুজ পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

হাত যখন ওপরে তোলা গেল না, অ্যালিস তখন মাথা নিচু করে হাতের নাগাল পাবার চেষ্টা করলে; দেখে স্বস্তি পেলে যে, গলাটা তার যেদিকে ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে ঘোরান-ফেরান যাচ্ছে, ঠিক সাপের মতো। নানানভাবে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে গলাটাকে যখন সে প্রায় নিচের বড়ো-বড়ো গাছের ওপরকার সবুজ পাতার কাছাকাছি

এনে ফেলেছে, পাতার ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে নিচে উঁকি মারবার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনি হুস করে একটা জোর আওয়াজে চমকে গিয়ে ঝট করে মাথাটাকে তুলে নিতে হল। একটা বেশ বড়োসড়ো পায়রা উড়তে উড়তে তার মুখের ওপর এসে পড়ে ডানা দিয়ে ঠাস-ঠাস করে তার মুখে ঝাপটা মারছে।

পায়রাটা চিৎকার করলে, "সাপ, সাপ!"

অ্যালিস রেগে-মেগে বললে, "মোটেই আমি সাপ নই। জ্বালিও না বলছি আমায়!"

পায়রা বললে, "আবার বলছি, তুমি সাপ!" এবারে অবশ্য তার গলা একটু নরম। তারপর প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "কত-রকমই তো উপায় ঠাওরালাম, কিন্তু কিছুই হল না, ওদের নিয়ে কিছুতেই আর পারা গেল না!"

অ্যালিস বললে, "তোমার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

অ্যালিসের কথায় কান না দিয়ে পায়রা বলেই চললে, "গাছের শেকড়ে চেষ্টা করে দেখেছি, নদীর পাড়ে দেখেছি, ঝোপে চেষ্টা করেছি— কিন্তু ঐ-সব বদমাস সাপ! ওদের মন পাওয়া ভার!"

আরো বেশি করে ধাঁধায় পড়ল অ্যালিস, কিন্তু ভাবলে, পায়রার কথা শেষ হবার আগে কথা বলে কোনো লাভ হবে না।

পায়রা বললে, "আহা ডিম পাড়ায় যেন কোনো ঝঞ্ঝাট, নেই, অথচ, রাত-দিন আমায় সাপের জন্যে তটস্থ হয়ে থাকতে হবে! এই তিনটে হপ্তা তো দু'চোখের পাতাই এক করতে পারিনি।"

অ্যালিস এবার যেন ব্যাপারটা খানিক আঁচ করতে পেরেছে। বললে, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমার দুঃখু হচ্ছে।"

পায়রা গলা চড়িয়ে বলে যেতে লাগল, "আমি কি-না এদিকে বনের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু গাছে বাসা বেঁধেছি, আমি কি-না ভাবছি যে, শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে রেহাই পেলাম, আমি কি-না ভাবছি যে এঁকে-বেঁকে আকাশ থেকে ওরা যদি এসে না পড়ে, তা হলে আমার আর কোনো ভয় নেই—আর ঠিক সেই সময়ে কি-না—! ওফ্! সাপ!"

"কিন্তু, আমি সত্যিই সাপ নই, বলছি শুনুন! আমি হচ্ছি, আমি হচ্ছি—"

"তা হলে তুমি কী? কী তুমি? একটা কিছু বানিয়ে বলবার চেষ্টা করছ, বেশ দেখতে পাচ্ছি!"

"আমি—আমি একটা ছোট্টো মেয়ে।" অ্যালিসের নিজের গলাতেই সন্দেহের সুর, কেননা, একদিনে এত বার সে বদলেছে।

গলায় খুব একটা বিদ্রূপ মিশিয়ে পায়রা বললে "গাল-গল্প আমার অবশ্য ভালোই লাগে। এই বয়েসে অনেক ছোটো-ছোটো মেয়েই তো দেখলুম, অমন একটা সিড়িঙ্গে গলা তো কারো দেখিনি। না, না! তুমি সাপ, নিশ্চয়ই সাপ, এতে কোনো ভুল নেই। এবার হয়তো বলেই বসবে যে, জীবনে কখনো ডিম-ই খাও নি!"

অ্যালিস বড়ো সত্যবাদী, তাই বলে ফেললে "খাব না কেন নিশ্চয়ই খেয়েছি; তবে ছোটো-ছোটো মেয়েরা তো ডিম খায়-ই, সাপেদের চেয়ে কিছু কমও খায় না।"

পায়রা বললে, "বিশ্বাস করি না; তবে, ছোটো মেয়েরা ডিম খায় এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমি বলব, তারাও নিশ্চয়ই এক ধরনের সাপ, তা ছাড়া আর কী।"

অ্যালিসের কাছে কথাটা এমন নতুন শোনাল যে, খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলে না, আর পায়রাটা সেই ফাঁকে বলে চলল, "এটা তো জানি যে, তুমি ডিমের তালে আছ, কাজেই তুমি ছোট্টো খুকিই হও আর সাপ-ই হও, তাতে আমার কী আসে-যায়?"

অ্যালিস সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "তোমার না গেলেও, আমার অনেক আসে-যায়! তবে ব্যাপারটা হল, আমি মোটেই ডিম খুঁজছি না। আর খুঁজলেও, তোমার ডিম নিতে আমার বয়ে গেছে, কাঁচা ডিম আমার একদম ভালো লাগে না।"

"বেশ তো, তা হলে কেটে পড়, বলেই পায়রাটা আবার তার বাসায় গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল। আর অ্যালিস যতটা পারলে গাছপালার মধ্যে হেঁট হতে চেষ্টা করলে। তার গলাটা বার বার গাছের ডালপালায় জড়িয়ে যেতে লাগল, থেকে থেকে ছাড়িয়ে নিতে হল। কিছুক্ষণ বাদে তার মনে পড়ল যে, তার দু'হাতে তখনো সেই ব্যাঙের ছাতার টুকরো দু'টো রয়েছে। খুব সাবধানে সে একবার ডান হাতের, আর তার পর বাঁ হাতের টুকরোতে কামড় দিতে লাগল, একবার লম্বা, আর একবার বেঁটে হয়ে যেতে লাগল, আর,

এই করতে করতে শেষ অবধি যাহোক করে তার আসল মাপে এসে ঠেকল।

সারাক্ষণই তো বেচারিকে হরেকরকম মাপের হতে হয়েছে, নিজের ঠিক ঠিক মাপের ধারে-কাছেও আসতে পারেনি, তাই গোড়ায় গোড়ায় একটু কেমন-কেমন লাগল ; কিন্তু খানিক পরেই সব ঠিক হয়ে গেল, আর আবার সেই আগেকার মতো আপন মনে বকর বকর করতে শুরু করে দিলে, "যাক, আমার আদ্দেকটা কাজ তো হাসিল হল! উঃ, খালি খালি বদলাতে বদলাতে মাথা-টাথা গুলিয়ে যায় একেবারে! এই একরকম আছি, এক মিনিট বাদেই কী হব তার ঠিক নেই! যাই হোক, নিজের আসল মাপটা ফিরে পাওয়া গেছে. এখন সেই বাগানটাতে যাওয়া যায় কী করে, সেইটাই ভাবতে হবে।" এই সব ভাবতে ভাবতে অ্যালিস কখন একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছে, তার মাঝখানে ছোট্টো একটা বাড়ি, ইঞ্চি চারেক হবে। অ্যালিস ভাবলে, 'এ-বাড়িতে কে থাকে কে জানে, তবে এই চেহারায় ওখানে যাওয়া চলবে না ; দেখলে ভয় পেয়ে একেবারে মুচ্ছো-টুচ্ছো যাবে হয়তো!' এই ভেবে অ্যালিস তার ডান হাতের সেই ব্যাঙের ছাতার টুকরো থেকে একটু একটু করে খেতে লাগল ; তার পর যখন ছোটো হতে হতে ন' ইঞ্চির মতো দাঁড়াল, তখন এগিয়ে গেল বাড়িটার কাছাকাছি।

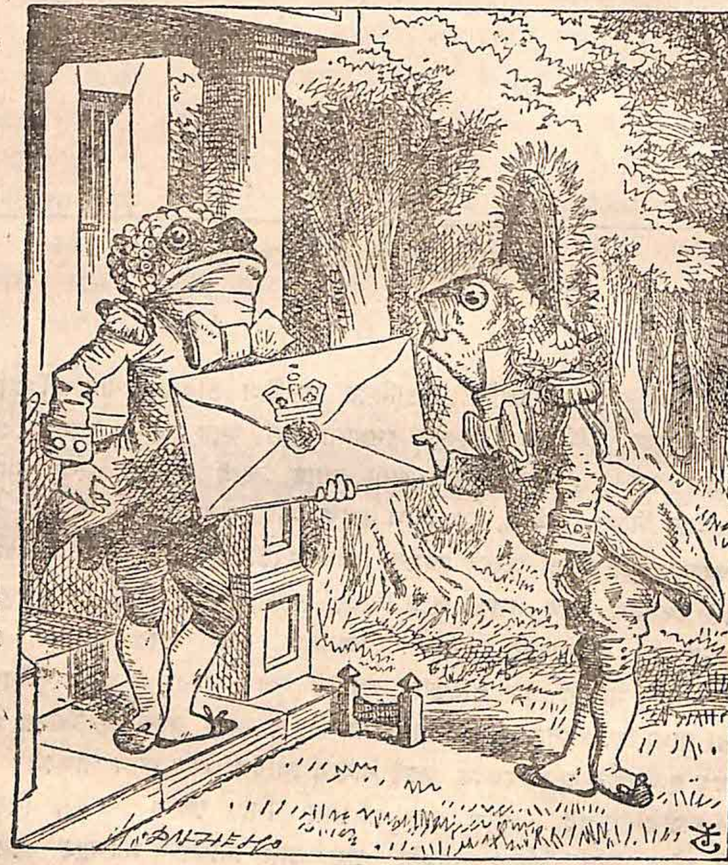
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শুয়োরছানা আর গোলমরিচ

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অ্যালিস ভাবছে এবার কী করবে এমন সময়ে উর্দিপরা একটা পেয়াদা বোঁ করে বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। (নেহাৎ উর্দি পরা আছে, তাই অ্যালিস ওকে পেয়াদা বলে ধরে নিলে ; নইলে, মুখ দেখে তাকে মাছ বলাই ঠিক।) তার পর আঙুলের গাঁট দিয়ে জোরে জোরে দরজায় টোকা মারতে লাগল। আর একটা পেয়াদা এসে দরজা খুলে দিলে, তার গায়েও উর্দি ; গাল-ফুলো বড়ো-বড়ো ড্যাবড্যাবে চোখ। অ্যালিস লক্ষ করে দেখলে যে, দু'জনেরই মাথার চুল পাউডার লাগিয়ে দুরস্ত করা, কুঁকড়ে কুঁকড়ে সারা মাথা ঢেকে রেখেছে। ব্যাপারটা কী, জানবার জন্যে অ্যালিসের খুব আগ্রহ হল, তাই জঙ্গল থেকে একটু বাইরে বেরিয়ে এসে কান পাতলে।

মাছ-পেয়াদাই প্রথমে তার বগলের নিচে থেকে একটা বিরাট খাম টেনে বার করল—খামটা প্রায় তার নিজের মাপেরই হবে—তার পর অন্য পেয়াদার হাতে দিয়ে খুব গুরুগম্ভীর গলায় বললে, "জমিদারগিন্নীর চিঠি। ক্রোকে খেলার জন্যে মহারানীর। নিমন্ত্রণ পত্র।" ব্যাঙ-পেয়াদাও ঐ একই ভঙ্গীতে সেই কথাই বললে—কেবল একটু ঘুরিয়ে—, "মহারানীর নিমন্ত্রণ পত্র। ক্রোকে খেলার জন্যে জমিদারগিন্নীর চিঠি।"

তার পর, দু'জনেই কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত সামনে ঝুঁকিয়ে সহবৎ দেখাতে গেল, তাতে ওদের দু'জনের চুলে চুলে গেল জড়িয়ে। অ্যালিস এতো জোরে হেসে ফেললে যে, শোনা যাবার ভয়ে দোড়ে আবার বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার পর সামলে-সুমলে নিয়ে আবার যখন বেরিয়ে এল, তখন দেখলে, মাছ-পেয়াদা চলে গেছে,



আর অন্য পেয়াদাটা দরজার কাছে মাটিতে বসে পড়ে হাঁদার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অ্যালিস খুব আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, তার পর ঠুক্ ঠুক্ করে তাতে টোকা মারলে।

পেয়াদা বললে, 'টোকা-ফোকা মেরে কিস্যু লাভ হবে না। তার

দু'টো কারণ ঃ প্রথম হচ্ছে, আমি তোমারই মতো দরজার বাইরের দিকেই বসে আছি ; আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ভেতরে সবাই এমন সোরগোল লাগিয়েছে যে, তোমার ঐ ঠুক্ ঠুক্ শব্দ কেউ শুনতেও পাবে না।" বাড়ির ভেতরে তখন সত্যিই এমন গোলমাল চলছে যে, কহতব্য নয়—অনবরত একটা হাঁউমাউ চিৎকার, হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো হাঁচির শব্দ, আর মাঝে মাঝে ঝন্ঝন্ ঠাঁইঠাঁই করে বাসনপত্তর ভাঙার আওয়াজ।

অ্যালিস বললে, "তা হলে কী করে ভেতরে যাওয়া যায়, বলে দিন না একটু দয়া করে !"

পেয়াদা সে কথায় কান না-দিয়ে নিজের কথার জের টেনে বলে চলল, "দরজাটা যদি তোমার আর আমার মাঝখানে থাকত, তা হলেও নাহয় কথা ছিল। যেমন ধরো, তুমি যদি ভেতর দিকে থাকতে, আর দরজা ধাক্কাতে, তা হলে আমি তোমায় বাইরে আসবার জন্যে দরজা খুলে দিতে পারতুম, বুঝলে ?" কথা বলার সময়ে পেয়াদাটা কিন্তু সারাক্ষণ আকাশের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ; অ্যালিসের মতে সেটা খবই অসভ্যতা। তার পর ভেবে দেখলে, 'তবে, বেচারা নাচার, চোখ দু'টো ওর বলতে গেলে একেবারে মাথার ওপর বসান। তা নাহয় হল, কিন্তু আমার কথার জবাবটা তো দিতে পারে।' এবার জোরেই বললে, "ভেতরে যাব কী করে ?"

পেয়াদা বললে, "আমি এখানেই বসে থাকব—আজও থাকব কালও থাকব—"

ঠিক সেই সময়ে দরজাটা খুলে গেল, আর একটা বড়ো প্লেট সাঁই-সাঁই করে পেয়াদার মুণ্ডু লক্ষ্য করে উড়ে এল ; তার নাক ঘেঁষড়ে দিয়ে পেছন দিকের একটা গাছের গায়ে লেগে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ল।

পেয়াদা কিন্তু তখনো সেই একইভাবে বলে চলেছে,—"কিম্বা হয়তো পরশুও থাকব"—যেন কিছুই হয়নি।

এবার আরো চিৎকার করে অ্যালিস বললে, "ভেতরে যাব কী করে, বল না।"

পেয়াদা বললে, "প্রথম কথা হল, বাড়ির ভেতর কি নেহাৎ যেতেই হবে ?"

প্রশ্নটা তুলেছে ঠিকই, তবে কি-না অ্যালিসের কানে কথাটা ভালো

লাগল না। বিড়্ বিড়্ করে বললে, "কী বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার, যে যেখানে আছে, সবাই কেবল তর্ক করে। মাথা খারাপ হবার যোগাড় একেবারে।"

পেয়াদা বোধ হয় দেখলে যে, তার বক্তব্যগুলো একটু বদল-সদল করে আবার একবার ঝালিয়ে নেবার এমন সুযোগ আর পাবে না, তাই বলতে লাগল, "আমি এখানেই বসে থাকব, কেবলই বসে থাকব, দিনের পর দিন বসে থাকব।"

অ্যালিস বললে, "কিন্তু, আমি এখন কী করি?"

পেয়াদা বললে, "যা তোমার খুশি।" তারপর আপন-মনে শিস্ দিতে শুরু করলে।

অতিষ্ঠ হয়ে অ্যালিস বললে, "ওফ্! এর সঙ্গে কথা কওয়া ঝকমারি। একেবারে নিরেট হাঁদাগঙ্গারাম।" বলেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঢুকেই যেখানে এল, সেটা একটা বিরাট রান্নাঘর, চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। ঘরের মাঝখানে তে-পায়া একটা টুলের ওপর বসে রয়েছেন জমিদারগিন্নী, কোলে তাঁর একটি বাচ্চা। একটা রাঁধুনী উনুনের ওপর ঝুঁকে পড়ে বিরাট একটা হাণ্ডার মধ্যে হাতা দিয়ে ঘোঁটাছে, মনে হল সূপ রাঁধছে।

হাঁচতে হাঁচতে অ্যালিস বললে, "উঃ, সূপটাতে গাদাগুচ্ছের মরিচ দিয়ে মরেছে দেখছি।"

ঘরের বাতাসেও কড়া মরিচের ঝাঁঝ। জমিদারগিন্নী নিজেও মাঝে মধ্যেই হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করছেন। আর বাচ্চাটার তো কথাই নেই, হয় হ্যাঁচছে, নাহয় ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে আকাশ-ফাটানো চিৎকার করছে, মোট কথা একবারও থামছে না। ঘরের মধ্যে দুটি প্রাণী দেখা গেল হাঁচছে না মোটেই—একজন সেই রাঁধুনী, আর অন্যটা হল একটা হুম্দো বেড়াল। বেড়ালটা এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত হাসি-হাসি মুখ করে হেঁসেলের ধারে গরমে বেশ আরাম করে বসে আছে।

অ্যালিস ঠিক বুঝতে পারল না আগ-বাড়িয়ে কথা বলা উচিত কি-না, তাই খুব বিনয় করে নরম গলায় বললে, "কিছু মনে করবেন না, আচ্ছা, আপনার বেড়ালটা অমন মুচকি হাসছে কেন?"

জমিদারগিন্নী বলে উঠলেন, "ওটা কাবলী বেড়াল, তাই। শুয়োর কোথাকার!"



শেষের কথা দুটো এতো আচমকা চটে গিয়ে বললেন যে, অ্যালিস তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল; তবে তক্ষুনি বুঝতে পারলে যে, কথাটা তাকে বলা হয়নি। বলা হয়েছে কোলের বাচ্চাটাকে। তখন সে সামলে নিয়ে আবার বললে, "কাবলী বেড়াল যে সব সময় হাসে, তা তো জানতুম না! তা ছাড়া, বেড়াল যে আবার মুচকি হাসতে পারে তাও তো শুনিনি কখনো।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "সব বেড়ালই পারে। আর বেশিরভাগ বেড়াল করেও তাই।"

আলাপ করবার সুযোগ পেয়ে অ্যালিসের খুব আনন্দ লাগছে তখন। খুব বিনয় করে বললে, "আমার জানাশোনা কোনো বেড়ালকে কখনো কিন্তু হাসতে দেখিনি।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "তুমি আর কতোটুকুই-বা জানো। বিশেষ কিছুই যে জানো না, এতে কোনো সন্দেহই নেই।"

কথাটা অ্যালিসের মোটেই ভালো লাগেনি, তাই ভাবলে, অন্য

কোনো ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা চালানোই ভালো। কী কথা পাড়া যায় ভাবছে এমন সময়ে রাঁধুনী উনুন থেকে সুপের হাণ্ডাটা নামিয়ে রাখলে, আর, সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে যা পেলে সটাসট্ ছুঁড়ে মারতে লাগল জমিদারগিন্নী আর তাঁর কোলের বাচ্চাটাকে টিপ করে। প্রথমে এল উনুন খোঁচাবার শিক; তার পর এক ঝাঁক সস্প্যান, প্লেট আর ডিশ। জমিদারগিন্নীর কোনো হেলদোল নেই, তাঁর গায়ে এসে লাগল কয়েটা, তাতেও তিনি নির্বিকার। আর বাচ্চাটা গোড়া থেকেই এমন চিল-চিৎকার করছে যে, তার চোট লেগেছে কি-না, বোঝবার কোনো উপায় নেই।

ভয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে অ্যালিস বলে উঠল, "আহা, আহা, কী করছেন কী, দয়া করে দেখুন তো, কী কাণ্ডটা করছেন আপনি। ঐরে। নাকটা গেল বোধ হয় বেচারার।" একটা ঢাউস সস্প্যান সাঁ করে বাচ্চাটার নাক ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

জমিদারগিন্নী হেঁড়ে গলায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, "যে যার নিজের চরকায় তেল দিলে পৃথিবীটা আরো তাড়াতাড়ি ঘুরতে পারত।

"তাতে কিন্তু খুব একটা সুবিধে হত না," এই তালে নিজের বিদ্যে জাহির করার মওকা পেয়ে অ্যালিসের খুব ভালো লাগছে। "একবার ভেবে দেখুন তো দিন আর রাত্তিরের দশাটা তখন কী দাঁড়াবে। ধরুন না, পৃথিবীটা চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করে পাক খাচ্ছে তার নিজের অক্ষের ওপর খাড়া হয়ে—"

জমিদারগিন্নী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "খাঁড়ার কথাই যখন উঠল, তা হলে বলি, এই খুকিটাকে কোতল কর!"

অ্যালিস দুরু দুরু বুকে রাঁধুনীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, হুকুমের মানেটা সে ধরতে পেরেছে কি-না; কিন্তু দেখা গেল তিনি এক মনে হাতা দিয়ে সুপ ঘুঁটছেন, কথা কানেই নেননি। তখন সে আবার শুরু করলে, "তা হলে হচ্ছে গিয়ে আপনার, চব্বিশ ঘণ্টা, তাই তো? সেইরকমই তো মনে হচ্ছে; না-কি বার ঘণ্টা? আমার—"

জমিদারগিন্নী বললেন, "আঃ, হাড় জ্বালিয়ে ছাড়লে, ও-সব অঙ্ক-ফঙ্ক আমার একদম ধাতে পোষায় না।" এই বলে তিনি আবার কোলের বাচ্চাটাকে আদর করতে লাগলেন, ঘুমপাড়ানী গানের মতো কী একটা

গাইতে শুরু করলেন, আর গানের এক-একটা কলির শেষে বাচ্চাটাকে ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন :

'খোকার সঙ্গে কইবে কথা দাঁত খিঁচিয়ে, ধমক দিয়ে ;
হাঁচলে পরেই রাম-পেঁদিয়ে ভূত ভাগাবে।
আর কিছু নয়, হাঁচছে ব্যাটা হাড় জ্বালানোর ফন্দি নিয়ে,
কারণ, জানে তাতেই মেজাজ বিগড়ে যাবে।'

এবার সবাই মিলে গাইলে (রাঁধুনি আর বাচ্চাটাও বাদ গেল না) :
'ওউ ! ওউ ! ওউ !'

গানের পরেরটুকু গাইবার সময়ে জমিদারগিন্নী এত জোরে জোরে কোলের বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লুফতে লাগলেন যে, তার হাঁউমাউ চিৎকারে গানের কথাগুলো অ্যালিস খুব ভালো করে শুনতে পেল না :

'খোকায় আমার বেদম ধাঁতাই, দাবড়ানি দিই বিষম রাগে,
হাঁচলে পরেই দমদমিয়ে পেটাই জোরে ;
কারণ, জানি এমনিতে তার মরিচগুঁড়ো ভালোই লাগে ;
ইচ্ছে করেই মিচ্‌কে ব্যাটা অমন করে।'
সবাই : 'ওউ ! ওউ ! ওউ !'

জমিদারগিন্নী বললেন, "এই নাও, ইচ্ছে হয় তো খানিকক্ষণ কোলে নিতে পার।" বলেই বাচ্চাটাকে অ্যালিসের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তার পর, "আমি যাই, সাজগোজ করিগে, মহারানীর সঙ্গে আবার ক্রোকে খেলতে যেতে হবে—" বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাঁধুনীটা সঙ্গে সঙ্গে একটা ফ্রাই-প্যান ছুঁড়ে মারলে তাঁকে তাগ করে, তবে একটুর জন্যে ফস্কে গেল।

অনেক কায়দা করে তবে অ্যালিস বাচ্চাটাকে বাগিয়ে ধরলে, কারণ তার দেহের গড়নটা যেন কেমন অদ্ভুত ধরনের ; তার ওপর কেবলই এলোপাথাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে। যেন তারামাছের মতো,' অ্যালিস মনে মনে বললে। অ্যালিসের কোলে এসে বাচ্চাটা ইঞ্জিনের মতো ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগল, আর, এক-একবার কুঁকড়ে দু-ভাঁজ হয়ে গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে সোজা টান্ টান্ হয়ে যেতে লাগল। এই-সমস্তর জন্যে প্রথমে মিনট দুয়েক তাকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে গেল অ্যালিস।

তারপর, যখন তাকে বেশ বাগিয়ে কোলে নেওয়া গেল (বাচ্চার দেহটাকে প্রায় কুণ্ডুলির মতো করে পাকিয়ে তার ডান কান আর বাঁ পাটাকে এক সঙ্গে চেপে ধরতে হল, যাতে আবার না ছিট্‌কে সোজা হয়ে যায়), তখন অ্যালিস সোজা বাইরের হাওয়ায় চলে এল। ভাবলে, 'সঙ্গে নিয়ে না-এলে, বাচ্চাটাকে ওরা দু-এক দিনের ভেতরে মেরেই ফেলত দেখছি।' বেচারাকে ওখানে ফেলে রেখে আসা মানে তো খুন করারই সামিল হত।' শেষ কথাগুলো একটু চেঁচিয়েই বলে ফেললে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল (ইতিমধ্যে তার হাঁচি থেমে গেছে)। অ্যালিস বললে, "চুপ কর, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কেউ কথা বলে না।"

বাচ্চাটা আবার ঘোঁৎ করে শব্দ করতেই অ্যালিস ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে। হুঁ, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ওর নাকটা বেশ খানিকটা ওপর দিকে ওল্টানো মতন—নাকের চেয়ে বেঁড়ে গোছের শুঁড়ের সঙ্গে তার মিল বেশি ; তা ছাড়া বাচ্চা ছেলে হলেও, চোখদু'টো যেন বড্ডো কুৎকুতে হয়ে গেছে ; সব জড়িয়ে তার চেহারাটা মোটেই পছন্দ হল না অ্যালিসের। ভাবলে, হয়তো বেচারি ফুঁপিয়ে কেঁদেছে বলেই এমন হয়েছে। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখছে জল আছে কি-না।

না, জলটল কিচ্ছু নেই। অ্যালিস বেশ ভেবে-চিন্তেই বললে, "দেখ বাছা, যদি সত্যিই শুয়োর বনে যাও, তা হলে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, বলে দিচ্ছি।" ক্ষুদে বাচ্চাটা আবার ফুঁপিয়ে উঠল (কিম্বা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলে হয়তো, বলা মুস্কিল,) আর অ্যালিস কোনো কথা না-বলে হাঁটতে লাগল।

অ্যালিস সবে ভাবছে, 'কিন্তু, বাড়ি ফিরে যাবার পর একে নিয়ে করবটা কী ?' আর, ঠিক সেই সময়ে বাচ্চাটা এমন জোরে একটা ঘোঁৎ শব্দ করে উঠল যে, বেশ একটু ভয় পেয়ে অ্যালিস আবার তার মুখের দিকে তাকাতেই দেখলে—নাঃ, এবার আর কোনোও ভুল নেই, বাচ্চাটার আগাপাশতলা এক্কেবারে শুয়োর। তখন ভেবে দেখলে, আর এটাকে বয়ে নিয়ে বেড়ানোর কোনো মানেই হয় না।

আস্তে আস্তে মাটিতে নামিয়ে দিতেই শুয়োরছানাটা বেশ নিশ্চিন্ত মনে টুক্‌টুক্ করে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল, অ্যালিসও হাঁফ ছেড়ে

বাঁচল। মনে মনে বললে, 'মানুষের বাচ্চা হিসেবে বড়ো হলে কী বিদিকিচ্ছির দেখতেই না হত; তবে বাচ্ছা শুয়োর হিসেবে দেখতে বরং ভালোই বলা যায়।' তার পর জানাশোনা অন্য-সব ছেলে-মেয়েদের কথা ভাবতে লাগল, শুয়োর হিসেবে যারা মোটেই বেমানান হতো না। 'ওদের বদলে দেবার আসল উপায়টা যদি জানা থাকত কারুর—'। অ্যালিস ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে কয়েক হাত তফাতে একটা গাছের ডালে সেই কাবলী বেড়ালটাকে বসে থাকতে দেখে সে চমকে উঠল।

অ্যালিসকে দেখে বেড়ালটা কেবল হাসিহাসি মুখ করলে। দেখে বেশ শান্তশিষ্টই মনে হয়। তবে যেমন বড়ো-বড়ো থাবা, তেমনি এক গাদা দাঁত, কাজেই অ্যালিস ভাবলে একটু সমীহ করে চলাই ভালো।

অ্যালিস ডাকলে, 'কাব্‌লী পুষি।" একটু ভয়ে ভয়েই ডাকলে কারণ জানে না তো, এ-নাম ওর পছন্দ হবে কি-না। দেখা গেল বেড়ালের মুখের হাসিটা আরো বড়ো হল। অ্যালিস ভাবলে, 'যাক বাবা, এখনো তো চটেনি দেখছি।' আবার বললে, "এখান থেকে কোন্ দিকে যাব, দয়া করে একটু বলে দেবে?"

বেড়াল বললে, "কোথায় যেতে চাও, সেটা তারই ওপর নির্ভর করছে।"

অ্যালিস বললে, "ঠিক কোথায় যাব, তা নিয়ে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই—"

বেড়াল বললে, "তা হলে কোন্ দিকে যাবে না-যাবে তাতেই বা কী আসে-যায়।

অ্যালিস কথাটাকে মানিয়ে নেবার জন্যে বললে, "—না, মানে, কোথাও একটা পেঁছিতে হবে তো?"

বেড়াল বললে, "বেশ খানিকটা হাঁটলে কোথাও না-কোথাও পেঁছিবে তো বটেই।"

অ্যালিস ভেবে দেখলে, কথাটা ঠিকই বটে, কাজেই ঘুরিয়ে বললে, "ধারে-কাছে যারা থাকে, তারা কী রকম লোক?"

বেড়াল ডান থাবাটা ঘুরিয়ে বললে, "ঐ দিকে থাকে একটা টুপিওলা," তারপর বাঁ থাবাটা ঘুরিয়ে বললে, "আর ঐ দিকে থাকে চৈতী খরগোশ। যে কোনো একজনের কাছে যেতে পার; দুজনেই পাগল।"

অ্যালিস বললে, "আমি কিন্তু পাগলের পাল্লায় পড়তে চাই না বাপু।"

বেড়াল বললে, "উপায় নেই, এখানে আমরা সবাই পাগল। আমি পাগল। তুমি পাগল।"



অ্যালিস বললে, "কী করে জানলে, আমি পাগল?"

বেড়াল বললে, "হতেই হবে, তা না হলে কি আর এখানে আসতে?"

যুক্তিটা খুব পাকা বলে মনে হল না অ্যালিসের, তবু বললে, "আর তুমি? তুমি যে পাগল, তা জানলে কী করে?"

বেড়াল বললে, "প্রথমে ধর, কুকুর পাগল নয়। মানো তো?"

অ্যালিস বললে, "তাই তো মনে হয়।"

বেড়াল বলতে লাগল, "তাই যদি হয়, তা হলে দেখ, কুকুর যখন রেগে যায়, তখন গোঁ গোঁ করে, আর ফুর্তি হলে ল্যাজ নাড়ে; অথচ, আমি ফুর্তি হলে গোঁ গোঁ করি, আর রেগে গেলে ল্যাজ নাড়ি। কাজেই, আমি পাগল।"

অ্যালিস বললে, "ওকে গোঁ গোঁ বলে না, গর্‌গর্‌ বলে।"

বেড়াল বললে, "তা সে তোমার যা ইচ্ছে বলতে পার। আজ রানীর সঙ্গে ক্রোকে খেলতে যাচ্ছ না-কি ?"

অ্যালিস বললে, "খেলতে পেলে তো খুবই আনন্দ হত, কিন্তু আমার তো নেমন্তন্নই হয়নি।"

"আমার সঙ্গে সেখানেই দেখা হবে," বলে বেড়ালটা হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

অদ্ভুত কাণ্ড দেখে দেখে অ্যালিসের এমন সয়ে গেছে যে, এতে সে মোটেই অবাক হল না। বেড়ালটা যেখানে বসেছিল, সেই জায়গাটার দিকে তখনো তাকিয়ে রয়েছে, এমন সময়ে আবার বেড়ালটাকে দেখা গেল।

বললে, "হ্যাঁ, ভালো কথা, বাচ্ছাটার কী হল ? জিগেস করতে ভুলেই যাচ্ছিলুম আর-একটু হলে।"

বেড়ালটার অদৃশ্য হওয়া বা ফিরে আসাটা যেন কিছুই অদ্ভুত ব্যাপার নয়, এইভাবে অ্যালিস জবাব দিলে "বাচ্ছাটা শুয়োরছানা হয়ে গেল।"

"জানতুম, ওটা শুয়োরই হয়ে যাবে," বলে বেড়ালটা আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অ্যালিস ভাবলে বেড়ালটা আবার হয়তো দেখা দেবে, তাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলে, কিন্তু মিনিট দুয়েক পরেও যখন তাকে দেখা গেল না, তখন, যেদিকে চৈতী খরগোশ থাকে, সেই দিকে পা বাড়ালে। আপন মনে বলতে লাগল, 'টুপিওলা তো অনেক দেখেছি, চৈতী খরগোশটাই বেশ মজার হবে মনে হচ্ছে। আর, এটা তো মে মাস, এখনো বোশেখ চলছে, কাজেই একেবারে খ্যাপা উন্মাদ হবে না নিশ্চয়ই— অন্তত চৈত্র মাসের চেয়ে কম তো হবেই।' বলতে বলতে উপর দিকে চোখ পড়তেই আবার দেখা গেল বেড়ালটা গাছের ডালে এসে বসে আছে।

বেড়াল বললে, "তখন কী বললে যেন—'শুয়োর' না 'দুয়োর' ?"

অ্যালিস বললে, "বললুম শুয়োর। আর, তুমি বাপু হঠাৎ হঠাৎ অমন করে উবে যেও না আর দেখা দিও না, মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।"

"বেশ ভালো কথা", এই বলে বেড়ালটা এবার অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে অদৃশ্য হতে লাগল ; ল্যাজের ডগা থেকে শুরু করলে,

শেষ করলে হাসি দিয়ে। সমস্ত কিছু উবে যাওয়ার পরেও, কেবল হাসিটুকু বেশ কিছুক্ষণ শূন্যে ভেসে রইল।

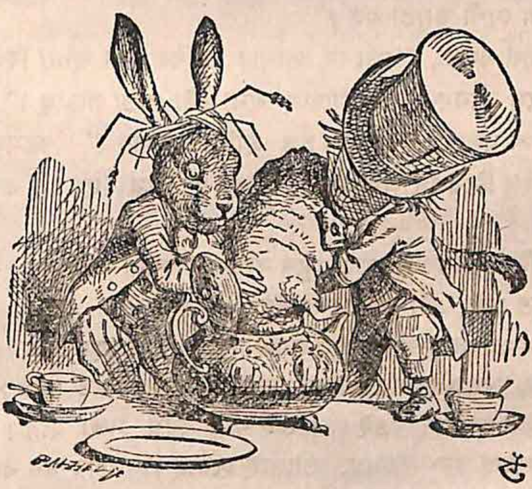


অ্যালিস ভাবলে, "বেশ তো। হাসি-ছাড়া বেড়াল তো কতো দেখেছি, কিন্তু বেড়াল-ছাড়া হাসি! এমন তাজ্জব ব্যাপার জন্মে দেখিনি, বাবা।"

বেশি দূর যেতে হল না, চৈতী খরগোশের বাড়িটা দেখা গেল। বাড়ির ছাদের ওপরকার চিমনিগুলোর গড়ন কানের মতো, আর চালটা লোম দিয়ে ছাওয়া, কাজেই অ্যালিস বুঝলে যে, ঐ বাড়িটাই হবে। বাড়িটা বেশ উঁচু, তাই বাঁ হাতের ব্যাঙের ছাতার টুকরোটায় কয়েকটা কামড় দিয়ে ফুট দুয়েক লম্বা হয়ে নিলে; তার পর বাড়িটার কাছে যেতে ভরসা হল। তবু, একটু ভয়ে ভয়েই এগোতে লাগল; মনে মনে বললে, 'বলা যায় না তো, যদি সত্যিই একেবারে উদোম পাগল হয়! এখন দেখছি টুপিওলার কাছে গেলেই ভালো হত।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খ্যাপা-মার্কা চায়ের আসর



বাড়ির সামনে গাছের তলায় টেবিল পাতা, চৈতী খরগোশ আর টুপিওলা সেখানে বসে চা খাচ্ছে ; তাদের দু'জনের মাঝখানে বসে আছে একটা গেছো ইঁদুর, ঘুমিয়ে একেবারে কাদা। আর ওরা দু'জন তার ঘাড়ের ওপর কনুয়ের ভর রেখে তার মাথার ওপর দিয়ে দিব্যি কথাবার্তা

চালাচ্ছে। অ্যালিস ভাবলে, 'গেছো ইঁদুরটার ভারি অসুবিধে তো ; তবে, ঘুমোচ্ছে বলেই হয়তো গায়ে মাখছে না।'

টেবিলটা বেশ প্রকাণ্ড, কিন্তু তবু, তিনজনে এক কোনায় জড়ো হয়ে বসে আছে। অ্যালিসকে দেখতে পেয়েই সবাই বলে উঠল, "জায়গা নেই ! মোটে জায়গা নেই !" অ্যালিস চটে উঠে বললে, "এক গাদা জায়গা আছে !" বলে টেবিলের এক পাশে একটা বড়ো আরাম-চেয়ারে বসে পড়ল।

চৈতী খরগোশটা বেশ আপ্যায়নের সুরে বললে, "একটু আঙুরের রস খাও।"

অ্যালিস তন্ন তন্ন করে টেবিলটা দেখলে, কিন্তু কেবল চা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। "আঙুরের রস তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।"

চৈতী খরগোশ বললে, "নেই, তো দেখবে কোত্থেকে।"

অ্যালিস রাগ করে বললে, "তা হলে আমায় আঙুরের রস খেতে বলাটা মোটেই ভদ্রতা হয়নি।"

চৈতী খরগোস বললে, "আর, না-ডাকতেই যে টেবিলে এসে বসলে, সেটা কোন্ দেশী ভদ্রতা হল ?"

অ্যালিস বললে, "এটা যে তোমার টেবিল, তা জানা ছিল না, তিন-জনের চেয়ে অনেক বেশি লোকের জন্যে এটা পাতা হয়েছে।"

টুপিওলা বললে, "তোমার চুল ছাঁটা দরকার।" অনেকক্ষণ ধরেই খুব কৌতূহল নিয়ে সে অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে ছিল। এই প্রথম মুখ খুললে।

অ্যালিস খানিকটা কড়া সুরে বললে, "কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে নেই, এটা ছোটোলোকমি !"

এই কথা শুনে টুপিওলার চোখ দু'টো ছানাবড়া হয়ে গেল ; কিন্তু, শুধু বললে, "কাক কেন লেখবার ডেস্কোর মতন, বলতে পার ?"

অ্যালিস ভাবলে, 'এই তো, এই বার বেশ মজা হবে ! ধাঁধাঁ-টাঁধা জিগেস করতে শুরু করেছে, ভালোই হয়েছে।' তার পর বললে, "আঁচ করতে পারব মনে হচ্ছে।"

খরগোশ বললে, "তার মানে কি বলতে চাও যে, এই উত্তরটা তুমি বার করতে পারবে ?"

অ্যালিস বললে, "ঠিক তাই !"

খরগোশ সঙ্গে সঙ্গে বললে, "তা হলে, যা বোঝাতে চাও, তাই-ই বলা উচিত তোমার।"

অ্যালিসও জবাব দিলে, "তাই তো করি। অন্তত—অন্তত, যা বলি ঠিক তাই-ই বোঝাতে চাই—একই তো ব্যাপার।"

টুপিওলা বললে, "মোটেই এক ব্যাপার নয়। তা হলে তো বলতে পার "আমি যা খাই, তা দেখতে পাই' বলাও যা, আর, 'আমি যা দেখি, তাই-ই খাই' বলাও তা !"

খরগোশটা বললে, "তা হলে তো এও বলতে পার যে, "আমি যা পাই, তা চাই' আর 'যা চাই তাই-ই পাই' একই কথা।"

গেছোইঁদুরটা মনে হল ঘুমতে ঘুমতেই ফোড়ন কাটলে, "বলতে পার 'যখন ঘুমোই, তখন নিঃশ্বাস নিই' যা, আর, "যখনই নিঃশ্বাস নিই, তখনই ঘুমোই' বলাও তা !"

টুপিওলা গেছোইঁদুরের দিকে চেয়ে বললে, "তোমার বেলা অবশ্য এক কথাই বটে।" এর পর আর কথাবার্তা হল না, মিনিটখানেক সবাই চুপচাপ রইল, আর সেই ফাঁকে অ্যালিস সেই কাক আর লেখার ডেস্কোর ধাঁধাঁটার উত্তর বের করার চেষ্টা করতে লাগল।

প্রথমে কথা বললে টুপিওলা, "আজকে মাসের ক'তারিখ ?" অ্যালিসের দিকে মুখ ফিরিয়েই বললে। ইতিমধ্যে সে পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার করে বার বার ভুরু কুঁচকে দেখছে, মাঝে মাঝে ঝাঁকাচ্ছে আর কানের কাছে লাগিয়ে শুনছে।

একটু ভেবে নিয়ে অ্যালিস বললে, "চৌঠো।"

টুপিওলা ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, "দুদিনের গরমিল।" তার পর চৈতী খরগোশের দিকে ফিরে বললে, "তখনই বলেছিলুম মাখনের কম্ম নয়।"

খরগোশ কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দিলে, "একেবারে সরেস মাখন ছিল, কিন্তু।"

টুপিওলা বললে, "তা ঠিক, তবে মাখনের সঙ্গে কিছুটা পাঁউরুটির গুঁড়োও ভেতরে চলে গেছে বোধ হচ্ছে। রুটি-কাটা ছুরি দিয়ে মাখন লাগানোটা ঠিক হয়নি তোমার।"

খরগোশ তখন থমথমে মুখ করে ঘড়িটা নিয়ে খানিকক্ষণ দেখলে,

তার পর তার চায়ের কাপের মধ্যে চুবিয়ে নিয়ে আবার দেখলে, কিন্তু বেচারা বলবার মতো নতুন কোনো কথা খুঁজে না-পেয়ে সেই আগের কথাটাই আওড়ালে ফের, "মাখনটা কিন্তু একেবারে সরেস ছিল, জানলে!"

অ্যালিস খুব আগ্রহভরে আড়চোখে দেখছিল। বললে, "কী আজব ঘড়ি রে বাবা! তারিখ বলা যায়, অথচ সময় বলা যায় না!"

টুপিওলা বিড়্ বিড়্ করে বললে, "কেনই-বা বলা যাবে? তোমার ঘড়িতে সাল বলা যায়?"

অ্যালিস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "বলা যায়-ই না তো, তার কারণ হল, অনেক দিন ধরে তো একই সাল থাকে।"

টুপিওলা বললে, "আমার বেলাতেও অবস্থাটা ঠিক তাই।"

অ্যালিসের ভয়ানক ধোঁকা লাগল। টুপিওলার কথার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলে না, অথচ ভাষায় কোনো গণ্ডগোল নেই। যথা-সম্ভব বিনয় করে বললে, "মানেটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

টুপিওলা বললে, "গেছোইঁদুরটা আবার ঘুমছে," বলেই তার নাকে খানিকটা গরম চা ঢেলে দিলে।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে চোখ না চেয়েই গেছোইঁদুর বললে, "একশো বার, একশো বার; আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

আবার অ্যালিসের দিকে ফিরে টুপিওলা বললে, "ধাঁধার উত্তরটা বার করতে পারলে না-কি?"

উত্তরে অ্যালিস বললে, "না, আমার দ্বারা হবে না। কী উত্তর বলুন তো?"

টুপিওলা বললে, "কিছু জানি না।"

খরগোস বললে, "আমিও জানি না!"

হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অ্যালিস বললে, "উত্তর হয় না এমন সব ধাঁধা বলে সময়টা নষ্ট না করে, কাজের কিছু করলে ভালো হত না?"

টুপিওলা বললে, "সময়কে আমি যতখানি চিনি, তুমি যদি ততখানি চিনতে, তা হলে ওকে 'টা' বলতে না, বলতে সময় 'বাবু'।"

অ্যালিস বললে, "বুঝলুম না।"

অবজ্ঞাভরে মাথা দোলাতে দোলাতে টুপিওলা বললে, "বুঝতে তো পারবেই না। আমি জোর করে বলতে পারি সময়ের সঙ্গে কখনো কথাবার্তাও হয়নি তোমার।"

অ্যালিস এবার একটু সাবধান হয়ে জবাব দিলে, "খুব সম্ভব হয়নি, তবে, যখন গান শিখি, তখন ঠিক ঠিক সময়ে হাতে তাল মারতে হয়, তা জানি।"

টুপিওলা বললে, "অ্যাই তো, ধরে ফেলেছি। মারলে ও ভীষণ চটে যায়। ব্যাপার হল, ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখলে ঘড়ির ব্যাপারে তুমি যা চাও, ও তাই-ই করে দেবে। যেমন ধর, এখন সকাল ন'টা বেজেছে, পড়তে যেতে হবে; কিচ্ছু না, সময়বাবুর কানে ফিস্‌-ফিস্ করে ইশারায় একটু জানিয়ে দাও, ব্যস্। এক লহমায় ঘড়ির কাঁটা সাঁ করে ঘুরে যাবে। বেলা দেড়টা, দুপুরে খাবার সময়!"

(খরগোশ আপন মনে বিড়্ বিড়্ করে বললে, "আহা, তাই যদি হত রে!")

অ্যালিস ভাবনামেশানো গলায় বললে, "ব্যাপারটা তো খুবই চমৎকার, কিন্তু তখনো আমার খিদে পাবে না, বুঝতেই পারছ।"

টুপিওলা বললে, "প্রথম মুখে পাবে না, তবে যতক্ষণ খুশি বেলা দেড়টাতেই সময়কে বেঁধে রাখতে পারছ তো।"

অ্যালিস বললে, "তুমি কি এইরকম করেই কাজ সার না-কি?"

অতি দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে টুপিওলা বললে, "না, আমার বেলা তা হয় না। গত চৈত্র মাসে আমাদের ঝগড়া হয়ে গেছে—" তার পর হাতের চামচটা দিয়ে খরগোশের দিকে ইশারা করে বললে "—যে-সময়ে ও পাগল হয়ে গেল, ঠিক তার আগেই। ঘটনাটা ঘটেছিল হরতনের বিবির জলসায়, সেখানে আমায় এই গানটা গাইতে হয়েছিল—

'ঝিকমিক ঝিকমিক বাদুড়ের ছা
কোন্ তালে যাচ্ছিস সেটা বলে যা'

গানটা জান বোধ হয়?"

অ্যালিস বললে, "ঐরকমই কী যেন শুনেছি।"



টুপিওলা বলতে লাগল, "তার পরে এইরকম—

'কাপ-ডিশ রাখবার ট্রের মতো ভাসিয়া
আকাশেতে উড়ছিস হাসিয়া হাসিয়া।
ঝিকমিক, ঝিকমিক—'

এই সময়ে গেছোইঁদুরটা গা ঝাড়া দিয়ে ঘুমের মধ্যেই গেয়ে যেতে লাগল "ঝিকমিক, ঝিকমিক, ঝিকমিক, ঝিকমিক—"

আর এতক্ষণ ধরে এক নাগাড়ে একই কথা আওড়ে যেতে লাগল যে, তাকে চিমটি কাটতে, তবে থামে।

টুপিওলা বলে যেতে লাগল, "গানের প্রথম পদটা তখনো শেষ হয়েছে কি হয়নি, মহারানী গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'এ ব্যাটা সময়কে খুন করছে! একে কোতল কর!"

অ্যালিস চোখ বড়ো-বড়ো করে বললে, "কী হিংস্র রে, বাবা!"

টুপিওলা করুণ গলায় বলতে লাগল, "সেই থেকে ও আমার একটা কথাও রাখে না। সেই থেকে সব সময়ে ছ'টাই বেজে রয়েছে।"

অ্যালিসের মাথায় চট্ করে বুদ্ধি খেলে গেল; বললে, "ও, তাই জন্যে বুঝি এখানে এত-সব চায়ের বাসন-পত্র?"

ফোঁস্ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে টুপিওলা বললে, "ঠিক বলেছ, বিকেলের চা-খাবার সময় আর কিছুতেই পার হচ্ছে না; বাসন-পত্তর ধোবার ফুরসতটুকু পর্যন্ত নেই।"

অ্যালিস সাহস করে জিগেস করলে, "যখন একবার চায়ের থালা শেষ করে আবার নতুন করে শুরু কর, তখন কী হয় ?"

চৈতী খরগোশ একটা হাই তুলে বলে উঠল, "অন্য কোনো কথা হোক-না ; এক কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল্লাগে না বাপু। আমি বলি কি, এই খুকিটি একটা গল্প শোনাক।"

অ্যালিস সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললে, "ভারি মুশকিল হল তো, গল্প যে আমি জানিই না মোটে।"

তাই শুনে টুপিওলা আর চৈতী খরগোশ দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "তা হলে গেছোইঁদুর গল্প বলুক! উঠে পড় হে, গেছো-ইঁদুর, জেগে পড়!" বলে একসঙ্গে দুদিক থেকে তাকে খিমচতে লাগল।

গেছোইঁদুর খুব ধীরে ধীরে চোখ খুললে, তার পর ভাঙা-ভাঙা গলায় আস্তে করে বললে, "আমি কিন্তু মোটেই ঘুমোইনি। তোমাদের প্রত্যেকটি কথা আমার কানে গেছে।"

চৈতী খরগোস বললে, "আমাদের একটা গল্প বল।"

অ্যালিস বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোনাও শোনাও।"

টুপিওলা ফোড়ন কাটলে, "হ্যাঁ, আর চট্ করে শুরু করে ফেল, নইলে তার আগেই আবার ঘুমিয়ে পড়বে।"

খুব তড়বড় করে গেছোইঁদুর তার গল্প শুরু করলে, "এক সময়ে তিনটি বোন থাকত। তাদের নাম ছিল এল্‌সি, লেসি আর টিলি। একটা কুয়োর তলায় তারা থাকত—"

অ্যালিস বললে, "কী খেয়ে থাকত ?" খাবার-দাবারের দিকে অ্যালিসের ভয়ানক ঝোঁক।

মিনিট দুয়েক ভেবে নিয়ে গেছোইঁদুর বললে, "ঝোলা গুড় খেয়ে থাকত।"

অ্যালিস নরম হয়েই বললে, "তা কী করে হবে বল, শুধু ঝোলা গুড় খেয়ে থাকলে যে অসুখ করে যাবে।"

গেছোইঁদুর বললে, "তা-ই তো হল ; ভীষণ অসুখ করল ওদের!" অ্যালিস ভেবে দেখতে চেষ্টা করল, কী অদ্ভুত জীবন তাদের ; তবে ভাবতে গিয়ে এমন ধাঁধায় পড়ে গেল যে, সে-চেষ্টা আর করলে না, বললে, "কিন্তু, ওরা কুয়োর তলাতেই-বা থাকতে গেল কী দুঃখে ?"

এই সময়ে চৈতী খরগোশ খুব সমাদর করে অ্যালিসকে বললে, "আরো একটু চা নাও।"

অ্যালিস একটু গোঁসা করেই বললে, "এর আগে তো একবারও নিইনি। কাজেই আরো নেব কী করে?"

টুপিওলা বললে, "তার মানে তুমি এই কথা বলছ তো যে, তুমি আরো 'কম' নিতে পারবে না, তাই তো? কিছু না-নেওয়ার চেয়ে, কিছু বেশি নেওয়া অনেক সোজা।"

অ্যালিস বললে, "তুমি আগ-বাড়িয়ে কথা বলছ কেন? কে তোমাকে কথা বলতে ডেকেছে?"

টুপিওলা জিতে যাওয়ার সুরে বললে, "এবার? ব্যক্তিগত কথা এবার কার মুখ থেকে বেরল?"

এর কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে অ্যালিস নিজেই একটু চা আর মাখন-রুটি নিলে, তার পর গেছোইঁদুরের দিকে ফিরে আবার প্রশ্ন করলে, "ওরা কুয়োর তলায় থাকত কেন?"

গেছোইঁদুর আবার মিনিট দুয়েক সময় নিলে, তার পর বললে, "ওটা ছিল ঝোলা গুড়ের কুয়ো, তাই।"

অ্যালিস রেগে-মেগে বলতে গেল, "ঝোলা গুড়ের কুয়ো বলে কিছু হয় না।" কিন্তু টুপিওলা আর চৈতী খরগোশ 'শ্-শ্-শ্-শ্' করে বাধা দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। গেছোইঁদুর মুখ গোমড়া করে বললে, "যদি শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকতে না পার, তা হলে গল্পটা তুমি নিজেই শেষ করে নাও।"

অ্যালিস বললে, "না, না। দয়া করে বাকিটুকু বল, ভাই। আর আমি বাগড়া দেব না। আমি বলছি তো, ঝোলা গুড়ের কুয়ো থাকতেও পারে, অন্তত একটা হয়তো আছে কোথাও।"

গেছোইঁদুর বেশ চটে গিয়ে বললে, "হুঁঃ, একটা!—তা, সেই ছোটো ছোটো তিন বোন তারা টানতে শিখল।" অ্যালিস বাধা দেবে না বলে কথা দিয়েছিল, সে-সব ভুলে গিয়ে বলে ফেললে, "কী টানত?"

গেছোইঁদুর এবারে আর রাগ করলে না, বললে, "ঝোলা গুড়?"

টুপিওলা বলে উঠল, "আমার একটা পরিষ্কার কাপ দরকার। এস, সবাই এগিয়ে এগিয়ে বসি।"

বলেই সে তার পরের চেয়ারটায় বসল, গেছোইঁদুরও তাই করলে;

চৈতী খরগোশ গিয়ে বসল গেছোইঁদুরের জায়গায়, আর অ্যালিসকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসতে হল চৈতী খরগোশের জায়গায়। জায়গা বদলের ফলে একমাত্র টুপিওলারই সুবিধে হল ; অ্যালিসের খুবই খারাপ হল, কারণ ঠিক তার আগেই চৈতী খরগোশ তার প্লেটে দুধের পাত্রটা উল্টে ফেলে গেছে।

গেছোইঁদুরের মনে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না, তাই অ্যালিস খুব সাবধানে বললে, "একটা কথা ঠিক বুঝলুম না, কোথা থেকে তারা ঝোলা গুড় টেনে তুলত ?"

টুপিওলা বললে, "জলের কুয়ো থেকে যখন জল টেনে তোলা যায়, তখন ঝোলা গুড়ের কুয়ো থেকে ঝোলা গুড় তোলা যাবে না কেন ? অ্যাঁ, হাঁদাগঙ্গারাম ?"

শেষ কথাটা গায়ে না-মেখে অ্যালিস গেছোইঁদুরকে বললে, "কিন্তু ওরা তো কুয়োর ভেতরেই রয়েছে।"

গেছোইঁদুর বললে, "তা তো রয়েইছে, অনেক ভেতরে রয়েছে।"

এই উত্তর শুনে অ্যালিসের বুদ্ধি এমন ঘুলিয়ে গেল যে, গেছোইঁদুরের গল্পে অনেকক্ষণ আর বাগড়া দিলে না।

গেছোইঁদুরের ঘুম পাচ্ছিল, তাই হাই তুলতে তুলতে আর চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলতে লাগল, "তারা তো টানতে শিখল, তুলি টানতে শিখল, তুলির টানে আঁকতে লাগল—কতরকমের জিনিসই-না আঁকল, সব জিনিসেরই গোড়ার অক্ষর 'ই'—"

অ্যালিস বললে, "কেন ? 'ই' কেন ?"

চৈতী খরগোশ বললে, "নয়ই-বা কেন ?"

অ্যালিস চুপ করে গেল।

ইতিমধ্যে গেছোইঁদুরের চোখের পাতা বুজে গেছে, তন্দ্রাও এসে গেছে ; কিন্তু টুপিওলার চিমটি খেয়ে আঁক করে চমকে উঠে আবার বলতে লাগল, "—হ্যাঁ, সবকিছু 'ই' দিয়ে শুরু, যেমন ইঁদুর-ধরা-কল, ইন্দু ইচ্ছা, ইত্যাদি—জানোই তো, আমরা বলি, জিনিসটা যেন, 'ইত্যাদিতে একেবারে ইত্যাদি'—ইত্যাদির ছবি দেখেছ কখনো ?"

অ্যালিস ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললে, "বাঃ, বেশ তো, আমায় জিগেস করা কেন ; আমার তো বাপু মনে হয় না যে—"

টুপিওলা বললে, "তা হলে কথা না-বলে চুপ করে থাক।"

অ্যালিসের আর কতই-বা সয়; টুপিওলার এই ইতরের মতো ব্যবহারে অ্যালিস আর ধৈর্য রাখতে পারলে না। তিতিবিরক্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, সেখানে আর একদণ্ডও দাঁড়ালে না। গেছোইঁদুরটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল, আর বাকি দুজন লক্ষ্যও করলে না যে, অ্যালিস চলে যাচ্ছে। অ্যালিস হাঁটতে হাঁটতে দু-এক বার পেছন ফিরে তাকিয়েও ছিল—হয়তো ওরা তাকে ডাকবে। শেষ বারের মতো যখন পেছন ফিরে তাকালে, দেখলে টুপিওলা আর চৈতী খরগোশ প্রাণপণে গেছোইঁদুরটাকে টি-পট্‌টার মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করে চলেছে।

বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে অ্যালিস বললে, "কিছুতেই আর ও-মুখো হচ্ছি না! জন্মে কখনও এমন উদ্ভুট্টে চায়ের আসর দেখিনি, বাবা!"

বলতে বলতে দেখে, একটা গাছের গায়ে ছোট্ট একটা দরজা লাগানো রয়েছে—সোজা গাছের ভেতরে চলে যাওয়া যায়। ভাবলে, 'অদ্ভুত তো! তবে আজকের সবই তো অদ্ভুত। তা, ভেতরে ঢুকে গেলেই তো হয়।'

ঢুকেই দেখে—আবার সেই হল্‌-ঘর, হাতের কাছেই সেই ছোটো কাঁচের টেবিল। মনে মনে বললে, 'নাঃ, এবারে আরো গুছিয়ে-গাছিয়ে কাজ করতে হবে।' বলে, আগে সেই সোনালি চাবিটা নিয়ে, বাগানে যাবার দরজাটা খুলে ফেললে। তার পর সেই ব্যাঙের ছাতার টুকরো থেকে একটু-একটু কামড়ে খেতে লাগল। (পকেটে একটা টুকরো বরাবরই রেখে এসেছে সে।) যখন লম্বায় ফুট খানেক হল, তখন আর খেল না। তার পর সেই সরু পথটা হেঁটে পার হয়ে গেল; আর তার পর?—অ্যালিস এখন ঝলমলে ফুল আর ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা-ভরা সেই সুন্দর বাগানটার মধ্যে এসে গেছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহারানীর খেলার মাঠে

বাগানে ঢোকবার মুখেই একটা বড়ো গোলাপ গাছ, তাতে সাদা-সাদা গোলাপ ফুটে আছে, কিন্তু তিনজন মালী খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সব-কটা ফুলের গায়ে রঙ মাখাচ্ছে। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ভালো করে লক্ষ্য করবার জন্যে অ্যালিস একটু কাছে এগিয়ে যেতেই শুনতে পেলে, মালীদের একজন বলছে, "ওহে পঞ্জা, হাত সামলে হে, হাত সামলে! আমার গায়ে রঙের ছিটে লাগছে যে!"

পঞ্জা গোমড়ামুখে বললে, "তা কী করব, সাতা আমার কনুইতে ধাক্কা মারলে যে!"

তাই শুনে সাতা মুখ তুলে বললে, "বা ভাই, পঞ্জা, বেশ, বেশ! কেবল পরের ঘাড়ে দোষ চাপানো!"

পঞ্জা বললে, "তুমি আর কথা বল না, কালকেই তো শুনলুম, মহারানী বলছেন তোমার গর্দান নেওয়া উচিত।"

যে প্রথমে কথা বলেছিল, সে জিগেস করলে, "কীসের জন্যে গর্দান নেবে?"

সাতা বললে, "তাতে তোমার দরকারটা কী হে, দুরি?"

পঞ্জা বললে, "একশো বার ওর দরকার আছে, হাজার বার আছে। আমি বলে দিচ্ছি—কারণ হল, রাঁধুনিকে পেঁয়াজের বদলে ও রজনীগন্ধার

শেকড় এনে দিয়েছিল।"

সাতা তার হাতের বুরুশটা আছড়ে ফেলে সবে বলতে শুরু করেছে, "ভালো রে ভালো, যেখানে যত অন্যায়, আর—" এমন সময়ে অ্যালিসের ওপর চোখ পড়তেই সে আচমকা থেমে গেল ; বাকি দুজনও অ্যালিসের দিকে ফিরে তাকাল, আর, সব্বাই মাথা নিচু করে তাকে খাতির দেখালে।

অ্যালিস নরম গলায় বললে, "আচ্ছা, গোলাপ ফুলগুলোকে রঙ করছ কেন বল তো ?"

পঞ্জা আর সাতা কোনো কথা না-বলে দুরির দিকে তাকালে। দুরি নিচু গলায় বলতে লাগল, "শোন, ব্যাপার হচ্ছে, এই জায়গায় লাল গোলাপের গাছ থাকবার কথা, কিন্তু আমরা ভুল করে সাদা গোলাপ লাগিয়ে ফেলছি ; এখন, কোনো রকমে যদি মহারানীর চোখে পড়ে, আমাদের সবাইকার মুণ্ডু উড়ে যাবে, জানলে ? কাজেই বুঝতেই পারছ তো খুকি, মহারানী এদিকে এসে পড়ার আগেই আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করছি—।" পঞ্জা এতক্ষণ ইতিউতি তাকাচ্ছিল, দুরির কথা শেষ হবার আগেই আঁৎকে বলে উঠল, "মহারানী ! মহারানী !" আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজন ধড়াস্ করে সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে মুখ থুবড়ে। অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল, আর, অ্যালিস ঘুরে দাঁড়াল মহারানীকে দেখবে বলে।

প্রথমেই এল দশজন সৈন্য, হাতে তাদের ডাণ্ডা। এদের সবাই-কারই চেহারা ঐ মালী তিনজনের মতো-চ্যাপ্টা, আর একদিক লম্বা চৌকোণা আকারের, তারই চারকোণ থেকে বেরিয়েছে হাত আর পা। তার পর এল দশজন সভাসদ ; তাদের সারা দেহে রুইতনের মতো হীরে ঝকমক করছে। সৈন্যদের মতো এরাও এক-এক সারিতে দু'জন দু'জন করে দাঁড়িয়েছে। এরপর এল রাজবাড়ির ছেলেমেয়েরা ; এরাও দশজন। দু'জন দু'জন হাত ধরাধরি করে নেচেকুঁদে চলেছে তারা ; এদের সারা গায়ে হরতন আঁকা। এর পর এলেন সব অতিথি-সজ্জনরা—বেশির ভাগই রাজা বা রানী ; অ্যালিস দেখতে পেলে, এদের মধ্যে সেই সাদা খরগোশটাও রয়েছে। খুব একটা সন্ত্রস্তভাবে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সে এর ওর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে, আর যে যা জবাব দিচ্ছে, তাতেই হেঁ হেঁ করে হাসছে ; অ্যালিসের

কাছ দিয়ে যাবার সময়ে তাকে লক্ষ্যও করলে না। এর পর এল হরতনের গোলাম, টকটকে লাল ভেলভেটের একটা বালিশের ওপর মহারাজের মুকুটটা রেখে বয়ে নিয়ে আসছে। আর, এই জমকালো শোভাযাত্রার একেবারে শেষে আসছেন হরতনের রাজা আর হরতনের রানী !

মালীদের মতো তাকেও ঐরকম উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে কি-না, অ্যালিস ঠিক বুঝতে পারলে না; তবে, শোভাযাত্রার বেলা সেরকম কোনো নিয়ম-কানুনের কথা তো কখনো শোনেনি; আর, তা ছাড়া, অ্যালিস ভেবে দেখলে, 'সব্বাই যদি উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়েই পড়ে, কিছু দেখতেই যদি না পায়, তা হলে শোভাযাত্রা করে লাভটাই-বা কী ?' কাজেই সে নিজের জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

শোভাযাত্রা যখন অ্যালিসের ঠিক সামনা-সামনি এসেছে, তখন সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে অ্যালিসের দিকে তাকাল; মহারানী রুক্ষ গলায় বললেন, "এটা আবার কে ?" কথাটা বলা হল হরতনের গোলামকে। উত্তরে সে শুধু মাথাটা সামনের দিকে একবার ঝুঁকিয়ে ফিক করে হাসলে।

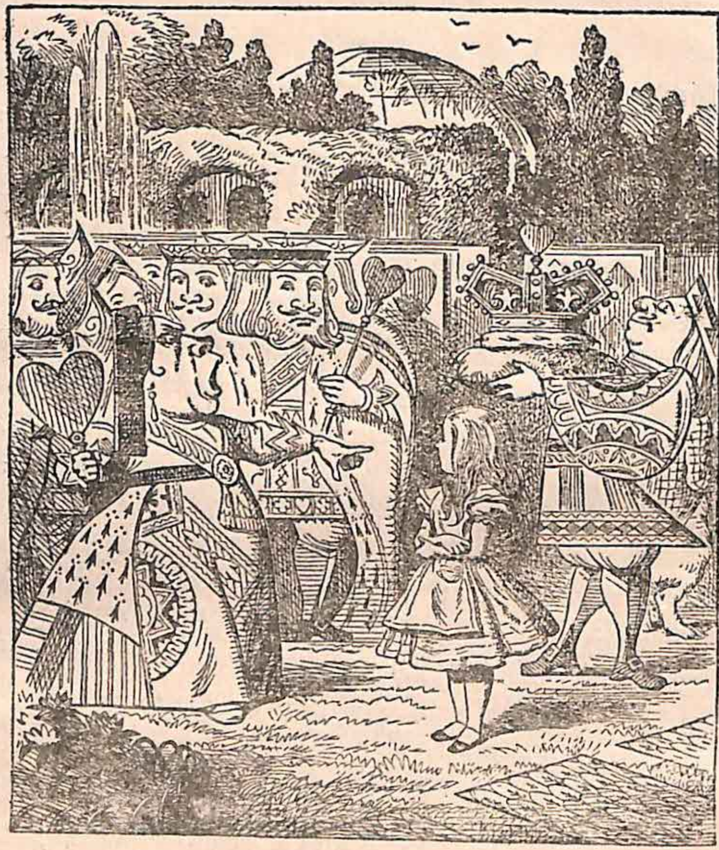
অধৈর্যে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মহারানী বললেন, "আহাম্মক !" তার পর অ্যালিসের দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার নাম কী খুকি ?"

খুব বিনয়ের সঙ্গে অ্যালিস বললে, "আমার নাম হল অ্যালিস, মহারানী।" বিনয় করলে বটে, তবে মনে ভাবলে, 'আরে বাবা, এক গোছা তাস ছাড়া তো কিছু নয়, অত সমীহ করার কী আছে !

সেই গোলাপ গাছটার এপাশে ওপাশে মালী তিনজন উপুড় হয়ে পড়েছিল, তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে মহারানী বললেন, "আর এরা কে ?" ব্যাপার হল, ওরা উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল বলে, ওদের পেছনকার নকশাই শুধু দেখা যাচ্ছে; আর, একগোছা তাসের সবকটারই পেছনকার নকশা তো একইরকম, তাই মহারানী বুঝতেই পারছেন না যে, ওরা মালী, না সৈন্য, না তাঁর ছেলেমেয়েদেরই কেউ কেউ।

"তা আমি কী করে জানব ? আমার কিসের মাথাব্যথা ?" কথাটা বলে অ্যালিসের নিজেরই আশ্চর্য লাগল—তার সাহস তো কম নয় !

মহারানী তো রেগে একেবারে সিঁদুরবর্ণ। অ্যালিসের দিকে বুনো জানোয়ারের মতো এক পলক তাকালেন, তার পর তারস্বরে, হুঙ্কার ছাড়লেন, "গর্দান নাও! কোতল—"



অ্যালিস বেশ চেঁচিয়েই সাফ জবাব দিলে, "ধ্যাৎ!" মহারানী একেবারে চুপ।

মহারাজ মহারানীর হাতের ওপর হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, "একটু ক্ষমাঘেন্না করে নাও, গো; বাচ্চা মেয়ে বৈ তো নয়!"

মহারানী রেগেমেগে ঝটকা মেরে তাঁর কাছ থেকে সরে এসে গোলামকে বললেন, "ওদের উল্টে দাও!"

খুব সন্তর্পণে একটা পা দিয়ে গোলাম তাদের উল্টে দিলে।

মহারানী খনখনে গলায় চীৎকার করে উঠলেন, "উঠে দাঁড়াও।" সঙ্গে সঙ্গে মালী তিনজন তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে মাথা ঝুঁকিয়ে রাজাকে, রানীকে, রাজবাড়ির ছেলেমেয়েদের, মায় বাকি সব্বাইকে সেলাম করতে লাগল।

মহারানী হুঙ্কার ছাড়লেন, "ঢের হয়েছে, থাম! আমার মাথা ঝিমঝিম করছে!" তার পর গোলাপ-গাছটার দিকে চেয়ে বললেন, "এখানে কী করা হচ্ছিল?"

দুরি এক হাঁটু গেড়ে খুব কাকুতি করে বললে, "মহারানী রাগ না-করেন তো বলি, আমরা চেষ্টা করছিলাম যে—"

ইতিমধ্যে মহারানী গোলাপ ফুলগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছেন; বললেন, "ও, এই ব্যাপার! এদের গর্দান নাও।" শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল আবার, তিনজন সৈন্য রয়ে গেল ওদের কোতল করবার জন্যে; মালী তিনজন প্রাণের ভয়ে ছুটে এল অ্যালিসের কাছে।

"কোনো ভয় নেই, কে তোমাদের গর্দান নেয় দেখি" বলে অ্যালিস তাড়াতাড়ি হাতের কাছে একটা ফুল-গাছের টবের মধ্যে তাদের রেখে দিলে। সৈন্য তিনজন মিনিট দুয়েক এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করলে, তার পর তক্ষুনি শোভাযাত্রার পেছন পেছন রওনা দিলে।

মহারানীর চীৎকার শোনা গেল, "ওদের ধড়ে আর মাথা নেই তো?"

সৈন্যরা তার উত্তরে চেঁচিয়ে বললে, "আজ্ঞে, রানীমা, ওদের মাথার কোনো পাত্তাই নেই।"

মহারানী বললেন, "বহুৎ আচ্ছা।" তার পর বললেন, "ক্রোকে খেলতে পার?"

সৈন্যরা কোনো উত্তর না-দিয়ে অ্যালিসের দিকে তাকালে, বোঝা গেল, প্রশ্নটা অ্যালিসকেই করা হয়েছে।

অ্যালিস চেঁচিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, পারি!"

মহারানী হুঙ্কার ছাড়লেন, "তা হলে চলে এস।" অ্যালিস শোভাযাত্রার সঙ্গে এগোতে এগোতে ভাবতে লাগল, এর পর বরাতে কী আছে, কে জানে।

পাশ থেকে মিন্‌মিনে গলায় কে বলে উঠল, "ভারি—ভারি সুন্দর দিনটা আজ!" পাশে পাশে সেই সাদা খরগোশটা চলেছে, আর

মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে তার মুখের দিকে খুব কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে।

অ্যালিস বললে, "খুব সুন্দর। জমিদারগিন্নী কোথায় ?"

খরগোশটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে গলা নামিয়ে বললে, "চুপ ! চুপ !" মাথা ঘুরিয়ে দু'পাশ দেখে নিয়ে ডিঙি মেরে অ্যালিসের কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "বিচারে ওঁর প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়ে গেছে।"

অ্যালিস বললে, "কী জন্যে ?"

খরগোশ জিগেস করলে, 'তুমি কি বললে, 'কী দুঃখের ?"

অ্যালিস বললে, "মোটেই তা বলিনি, ব্যাপারটা একদম দুঃখের বলে মনে হচ্ছে না আমার। আমি বলেছি, 'কী জন্যে ?"

খরগোশ বললে, "জমিদারগিন্নী মহারানীর কান মলে দিয়েছেন"— শুনে অ্যালিস খুব জোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। খরগোশ খুব ভয় পেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "আহা, চুপ কর-না, মহারানী শুনতে পাবেন যে ! ব্যাপারটা হল কী, জমিদারগিন্নী এসে পৌঁছতে দেরি করলেন, তাই মহারানী বললেন —"

বাজের মতো হুঙ্কার ছেড়ে মহারানী চেঁচালেন, "যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।" তাই শুনে সব্বাই এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগল, আর এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়তে লাগল। যাই হোক, শেষপর্যন্ত সব্বাই এক-এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে, খেলা শুরু হয়ে গেল। অ্যালিস ভেবে দেখলে ক্রোকে খেলার এমন উদ্ভুট্টে জায়গা সে জীবনে কখনো দেখেনি। মাঠময় লাঙল-চষা ক্ষেতের মতো ঢেউ খেলানো মাটি ! বল হচ্ছে সব জ্যান্ত জ্যান্ত এক ধরনের ছোটো জাতের শজারু ; হাতুড়ির মতো যে ব্যাট দিয়ে ক্রোকে খেলে, তার বদলে রয়েছে জ্যান্ত সারস পাখি ; আর, যে-সমস্ত ছোটো ছোটো খিলেনের মতো জিনিসের তলা দিয়ে বল গড়াতে হয়, সে-সব কিচ্ছু নেই ; তার বদলে সৈন্যরা দু-ভাঁজ হয়ে হাতে আর পায়ে ভর দিয়ে খিলেনের মতো চেহারা করে মাঠের এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

অ্যালিসের প্রথম মুশকিল হল, তার ভাগে যে সারস পাখিটা, সেটাকে বাগ মানানো। সারসের ঠ্যাং দুটো বাইরে ঝুলিয়ে রেখে দেহটাকে কোনরকমে বগলের তলায় ঠেসে কায়দা করে ধরতে পেরেছে



অ্যালিস—পাখিটারও বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই হচ্ছে কী, যখনই তার লম্বা গলাটাকে বেশ খাড়া সোজা করে নিয়ে তার মাথাটা দিয়ে শজারুর গায়ে বাড়ি মারতে যাবে, তখনই সারসটা গলাটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে মুখটা ওপরে তুলে এমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে আলিসের দিকে তাকাচ্ছে যে, হাসতে হাসতে অ্যালিসের পেট ফেটে যায়! কোনোরকমে গলাটাকে আবার সোজা নিচের দিকে নামিয়ে ফের যখন বলের দিকে তাগ করতে যায়, তখন দেখা যায় যে, শজারু মশাই গুটিয়ে বলের মতো হয়ে না-থেকে লম্বা হয়ে গুটি গুটি সরে পড়ছে। এ-সব ছাড়াও, শজারু-বলকে ব্যাটের বাড়ি মেরে যেদিকেই চালান করতে চেষ্টা করুক, লাঙলের ফালের নালা বা নালার ধারের মাটির ঢিবি—কিছু-না কিছু বাধা পড়বেই; আর, দু-ভাঁজ-হওয়া সৈন্যরা মাঝে মাঝেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাঠের মধ্যে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করে জায়গা বদলাচ্ছে; কাজেই খানিক বাদেই অ্যালিস টের পেলে যে, খেলাটা দারুন জটিল।

খেলোয়াড়রা নিজের নিজের দান আসবার আগেই সবাই একই সঙ্গে ব্যাট হাঁকড়াচ্ছে, অনবরত ঝগড়া করছে আর শজারু খুঁজে বেড়াচ্ছে; কাজেই দেখতে-না-দেখতে মহারানী তো ক্ষেপে আগুন! দুম দুম করে

পা ফেলে মিনিটে একবার করে চীৎকার করতে লাগলেন, "এর গর্দান নাও। ওর গর্দান নাও!"

অ্যালিসের বেশ অস্বস্তি বোধ হতে লাগল; মহারানীর সঙ্গে তার অবশ্য তখনো পর্যন্ত কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়নি, তবে যে-কোনো সময়ে হলেই হল। অ্যালিস ভাবলে, 'তখন কী হবে? মানুষের গর্দানের ওপর এদের যেরকম ভয়ানক লোভ দেখছি, এখনো যে একজনও বেঁচে আছে, সেটাই আশ্চর্য!"

কিভাবে এখান থেকে কেটে পড়া যায়, চারি দিকে তাকিয়ে তাই দেখছে, সবাইয়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় কী করে, তাই ভাবছে, এমন সময়ে দেখতে পেলে, বাতাসে অদ্ভুত মতন কী একটা জিনিস যেন দেখা যাচ্ছে। প্রথমে খুব ধোঁকা লাগল, তার পর মিনিট দুয়েক লক্ষ্য করার পর বুঝতে পারলে যে, ওটা হচ্ছে মুচ্‌কি হাসি। নিজের মনে বললে, 'কাবলী বেড়ালটা; যাক, কথা বলার মতো কাউকে একটা পাওয়া গেল।'

কথা বলতে গেলে মুখের যতটা দরকার, সেইটুকু ফুটে উঠতেই বেড়ালটা বললে, "কেমন চলছে?"

বেড়ালের চোখদুটো ফুটে ওঠার জন্য অ্যালিস অপেক্ষা করছিল, দেখা যেতে ঘাড় নাড়লে। ভেবে দেখলে, 'কান দুটো—একটা কান অন্তত দেখা না-গেলে কথা বলে কিছু লাভ নেই।' দেখতে-না দেখতে পুরো মুখটা ফুটে উঠল, আর অ্যালিস তার কাঁধ থেকে সারস পাখিটাকে নামিয়ে রেখে বেড়ালকে খেলার বর্ণনা দিতে লাগল। শোনবার মতো কাউকে যে পাওয়া গেছে, তাতে সে খুব খুশী। বেড়ালটা বোধ হয় ভাবলে, যতখানি দেখা গেছে, তাই-ই যথেষ্ট, কাজেই মুখ পর্যন্তই রইল, আর কিছু ফুটল না।

একটু নালিশের সুরেই অ্যালিস আরম্ভ করলে, "আমার তো মনে হল, খেলার রীতি-নীতির ধার ধারে না কেউই; তা ছাড়া, দিনরাত এমন কাঁউমাউ করছে যে, কারো কথাও শোনা যাচ্ছে না—আর, খেলার বিশেষ কোনো আইন-কানুনও কিছু আছে বলে মনে হল না; থাকলেও, মানবার দায় অন্তত কারোরই নেই দেখলুম—আর, জ্যান্ত জিনিস নিয়ে খেলা যে কী ঝকমারি, তা যদি জানতে! যেমন ধর, যে-খিলেনের তলা দিয়ে বল মারবার কথা, সেটা বেড়াতে বেড়াতে মাঠের অন্য দিকে

চলে গেল—আর, আমার শজারুটা যখন গড়িয়ে গিয়ে মহারানীর শজারুর গায়ে লাগবার কথা, তখন শজারুটাকে কাছে আসতে দেখে আগে-ভাগেই অন্য শজারুটা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।"

একটু নিচু গলায় বেড়াল বললে, "মহারানীকে কেমন লাগছে?"

অ্যালিস বললে, "একদম বিচ্ছিরি! ওঁর এত বেশি—" বলতে বলতে অ্যালিস দেখতে পেলে, ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহারানী তার কথা শুনছেন; সামলে নিয়ে বললে, "—ওঁর এত বেশি জেতবার সম্ভাবনা যে, শেষ অবধি খেলার কোনো দরকারই নেই।"

মহারানী একটু মুচকি হেসে সেখান থেকে চলে গেলেন।

মহারাজ অ্যালিসের কাছাকাছি এসে বেড়ালের মাথাটার দিকে খুব কৌতূহল নিয়ে তাকাতে তাকাতে বললেন, "কার সঙ্গে কথা বলছ?"

অ্যালিস বললে, "আমার বন্ধু—একটা কাবলী বেড়াল। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই।"

মহারাজ বললেন, "ওর চেহারাটা মোটেই সুবিধের ঠেকছে না। যাই হোক, ইচ্ছে করলে ও আমার হস্তচুম্বন করতে পারে।"

বেড়াল তাই শুনে বললে, "আমার বয়ে গেছে!"

"খাতির রেখে কথা বল, আর—আর, আমার দিকে ওরকম করে তাকিও না," বলতে বলতে রাজামশাই অ্যালিসের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

অ্যালিস বললে, "বেড়ালরা তো রাজার দিকে তাকায়, কোন একটা বইয়েতে যেন পড়েছি।"

রাজা বললেন, "ব্যাটাকে এখান থেকে সরাতে হচ্ছে।" রানী সেই সময়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডেকে বললেন, "দেখ, রানী, আমি চাই যে, তুমি এই বেড়ালটাকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করবে।"

ছোটো-বড়ো যে-কোনো মুশকিলেরই একটি মাত্র আসান রানীর জানা আছে; কোনো দিকে না-তাকিয়েই তিনি হাঁকলেন, "গর্দান নাও!"

"আমি নিজেই জল্লাদকে ডেকে আনছি," বলে রাজা খুব ব্যস্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

অ্যালিস ভাবলে, সেও গিয়ে একবার দেখে আসে খেলা কেমন চলছে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে রানী রেগেমেগে চিৎকার করছেন। নিজের নিজের দানের সময়ে খেলতে ভুলে গেছে বলে ইতিমধ্যেই তিন জনকে কোতল করবার হুকুম অ্যালিসের কানে গেছে। ব্যাপার স্যাপার দেখে

খুব খারাপ লাগল অ্যালিসের—এমন এলোমেলো কাণ্ড চলেছে যে, বোঝাই যাচ্ছে না তার খেলার দান কখন। সে তার শজারুটার খোঁজ করতে লাগল।

দেখা গেল, তার শজারুটা অন্য একটা শজারুর সঙ্গে মারামারি করছে। অ্যালিস দেখলে, বল দিয়ে বল মারার এই বেশ চমৎকার সুযোগ। কিন্তু মুশকিল হল, তার সারস পাখিটা ততক্ষণে মাঠের অন্য দিকে চলে গিয়ে কাছাকাছি একটা গাছে চড়ে বসবার জন্যে বার বার বৃথাই ওড়বার চেষ্টা করে চলেছে।

সারসটাকে ধরে আবার যখন অ্যালিস সেখানে ফিরে এল, শজারু দুটো ততক্ষণে মারামারি শেষ করে কোথায় সরে পড়েছে। অ্যালিস ভাবলে, 'যাকগে, তাতেই-বা কী। মাঠের এদিকে তো কোনো খিলেনই নেই, সব কটা ওদিকে গিয়ে জুটেছে।' সারসটাকে বেশ করে বাগিয়ে বগলের তলায় চেপে ধরলে অ্যালিস, যাতে না পালাতে পারে, তারপর বেড়াল-বন্ধুর সঙ্গে আবার একটু কথাবার্তা বলবার জন্যে পুরনো জায়গায় ফিরে এল।

ফিরে এসে দেখে, কাবলী বেড়ালের কাছাকাছি বেশ ভিড় জমে গেছে। জল্লাদ, রাজা আর রানীর মধ্যে তর্ক বেধে গেছে, তিনজনেই একই সঙ্গে কথা বলে চলেছে, আর, বাকি সবাই একেবারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে—মুখের চেহারা সুবিধের নয়।

অ্যালিস গিয়ে পৌঁছতেই তিনজনেই মীমাংসার জন্যে অ্যালিসকে সালিসী মানলে, বারবার নিজের নিজের বক্তব্য বলতে লাগল, আর, একসঙ্গে কথা বলার দরুন এমন সব তালগোল পাকিয়ে গেল যে, অ্যালিস তাদের কথা একবর্ণও বুঝতে পারলে না।

জল্লাদের বক্তব্য হচ্ছে : ধড় না-থাকলে মুণ্ডু কাটা যায় না ; এরকম উদ্ভট কাজ তাকে এর আগে কখনো করতে হয়নি ; আর, এই বয়েসে নতুন করে এরকম কাজ সে করবে না।

রাজার বক্তব্য হচ্ছে ঃ মুণ্ডু থাকলেই তা কাটা যায় ; আর জল্লাদ যেন বাজে না-বকে।

রানীর বক্তব্য হচ্ছে : এই মুহূর্তে কিছু একটা ব্যবস্থা না-করলে, যে যেখানে আছে, সব্বাইকার গর্দান নেবেন তিনি, কাউকে বাদ দেবেন না (তাঁর এই শেষের কথাটি শুনেই সবাইকার মুখ তোলো হাঁড়ি হয়েছে।)



বলবার মতো আর কিছু ভেবে না-পেয়ে অ্যালিস বললে, "বেড়ালটা জমিদারগিন্নীর, কাজেই তাঁকেই জিগেস করা হোক।"

রানী জল্লাদকে বললেন, "সে এখন জেলখানায় আছে, যাও, তাকে নিয়ে এস।" জল্লাদ তীরের মতো ছুটল।

আর, জল্লাদ চলে যেতেই বেড়ালের মাথাটা উবে যেতে শুরু করেছে; জমিদারগিন্নীকে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে একদম হাওয়া। রাজা আর জল্লাদ পাগলের মতো এদিক-সেদিক খুঁজে বেড়াতে লাগলেন, আর, বাকি সবাই যে-যার খেলতে চলে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

নকল কাছিমের জীবন-কথা

অ্যালিসের হাতে হাত গলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে জমিদারগিন্নী বললেন, "আবার তোমার সঙ্গে দেখা হল, বাছা—কী খুশিই যে হয়েছি, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।" দুজনে হাঁটতে লাগল।

জমিদারগিন্নীর মেজাজটা খুশ্ আছে দেখে অ্যালিসের ভালো লাগল; ভাবল, তখন রান্নাঘরে যে তাঁর মেজাজ অমন তিরিক্ষি ছিল, সেটা বোধ হয় মরিচের ঝাঁজের জন্যেই।

মনে মনে বললে, 'আমি যখন জমিদারনী হব (খুব একটা আশা আছে বলে মনে হচ্ছে না অবশ্য), আমার রান্নাঘরে মরিচের পাটই রাখব না একদম। মরিচ ছাড়াও স্যুপ কিছু খারাপ হয় না—লোকে যে বদ্‌মেজাজী হয়, সেটা হয়তো ঐ মরিচের জন্যেই।' এই নতুন ব্যাপারটা আবিষ্কার করে অ্যালিসের বেশ আনন্দ হল। আবার ভাবলে, 'আর, বোধ হয় ভিনিগারে মেজাজ খাট্টা হয়—মেথির জন্যে হয় তিতিবিরক্ত—আর, চিনি-টিনির জন্যে ছোটোরা অমন মিষ্টি হয়। সবাই যদি এই-সব নিয়মগুলো জানত, তা হলে মিষ্টি জিনিসগুলো আর অত টেনে খরচ করত না।'

জমিদারগিন্নী যে সঙ্গে রয়েছেন, সে কথা খেয়ালই নেই, তাই হঠাৎ কানের কাছে তাঁর গলা পেয়ে চমকে গেল প্রথমটা—"কিছু একটা

ভাবছ তুমি, সোনা, তাই কথা বলার দিকে খেয়াল নেই। এ-থেকে একটা নীতি-উপদেশ পাওয়া যায়, এক্ষুনি ঠিক মনে আসছে না, একটু বাদেই মনে পড়ে যাবে।"

অ্যালিস বলেই ফেললে, "এর কোনো নীতি-উপদেশ নেই-ই হয়তো।"

জমিদারগিন্নী চুক চুক শব্দ করে বললেন, "ওরে বাছা! সব কিছুরই মধ্যে একটা-না-একটা নীতি-উপদেশ থাকে, শুধু খুঁজে বার করে নিতে হয়।" বলতে বলতে তিনি অ্যালিসের গায়ের ওপর ঘেঁষে এলেন।

ওঁর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে অ্যালিসের মোটেই ভালো লাগছে না : প্রথমত, জমিদারগিন্নীর চেহারাটা বড্ডো বদখত ; দ্বিতীয়ত, অ্যালিসের তুলনায় তাঁর দেহের মাপটা এমনই যে, তাঁর থুতনিটা ঠিক একেবারে অ্যালিসের কাঁধের ওপর এসে ঠেকে ; থুতনিটা আবার তেমনি সরু খোঁচা মতন। তবে, অ্যালিস তাঁর মনে আঘাত দিতে চাইলে না, তাই যতটা পারে সরে যেতে লাগল। বললে, "খেলাটা আগের চেয়ে ভালোই চলছে, মনে হচ্ছে।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "হ্যাঁ, তা চলছে ; আর, এর মধ্যে যে নীতি-উপদেশ আছে, সেটা হল—'ভালোবাসাতেই পৃথিবী ঘোরে'।"

অ্যালিস বললে, "কে যেন বলেছিলেন, যে-যার নিজের নিজের কাজ করে গেলেই পৃথিবী ঘোরে।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "বাঃ, বেশ বলেছ! দুটো প্রায় একই কথা হল অবশ্য।" তারপর, অ্যালিসের কাঁধে তাঁর ছুঁচলো থুতনির খোঁচা মেরে আবার বললেন, "আর এর মধ্যে থেকে যে নীতি-উপদেশ পাওয়া যায়, সেটা হল 'যারে ফেল, সেই-রাখে'!"

অ্যালিস ভাবলে, 'নীতি-উপদেশ খুঁজে বার করতে কী প্রচণ্ড উৎসাহ!'

খানিক বাদে জমিদারগিন্নী বললেন, "তুমি বোধ হয় ভেবে অবাক হচ্ছ যে, আমি তোমার কোমর জড়িয়ে ধরছি না কেন। ব্যাপার হল, তোমার ঐ সারসটার মেজাজ কেমন তা তো বুঝতে পারছি না। একবার দেখব না-কি?"

অ্যালিসের তাতে মোটেই আগ্রহ নেই, তাই নম্রভাবে বললে, "পাখিটা যদি কামড়ে দেয়।"

জমিদারগিন্নী বললেন, ঠিক কথা, সারস পাখি আর রাই সর্ষে,

দুই-ই কামড়ায়। আর, এর নীতি-উপদেশ হচ্ছে—'পালক যাদের এক-রকম, সেই পাখিরা দল বেঁধে এক ঝাঁকে ওড়ে'।"

অ্যালিস ফুট কাটলে, "দুঃখের বিষয়, রাই সর্ষে পাখি নয়।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "আবার একটা খাঁটি কথা শোনালে। কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বল তুমি!"

অ্যালিস বললে, "যদ্দূর মনে হচ্ছে, রাই সর্ষে একধরনের খনিজ পদার্থ।"

জমিদারগিন্নী যেন অ্যালিসের সব কথাতেই সায় দেবার জন্য মুখিয়ে আছেন। বললেন, "ঠিক তাই। এই তো, কাছাকাছি একটা বিরাট রাই সর্ষের খনি রয়েছে। আর, এর নীতি-বাক্যটি হল, 'সর্ষের মধ্যে ভূত'।"

কথাটা অ্যালিসের কানে যায়নি; সে বলে উঠল, "এবার মনে পড়েছে, রাই সর্ষে একরকমের উদ্ভিজ্জ পদার্থ, দেখে অবশ্য তা মনে হয় না; কিন্ত তাই-ই।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "আমার মত-ও ঠিক তাই; আর এর নীতি-উপদেশ হল, 'তোমাকে দেখে যা মনে হয়, সেই রকমটি হও'; কিম্বা যদি আরো সহজ কথা চাও, তা হলে, 'তোমার আসল রূপের বদলে তোমায় অন্যরকম মনে করা, আর, তুমি যা, বা যা হতে পারতে বলে অন্য লোকের মনে হয়, তার মধ্যে কোনো অভিন্নতা নেই বলে অপরের যে-ধারণা, নিজেকে তার থেকে অভিন্ন বলে কক্ষনো মনে করবে না'।"

অ্যালিস বিনয় করে বললে, "কথাগুলো লিখে নিলে ভালো বোঝা যেত, কিন্তু, মুশকিল হচ্ছে, আপনার মুখ থেকে শুনে ঠিক মাথায় ঢুকল না।"

জমিদারগিন্নী খুব খুশীর সুরে বললেন, "এ তো কিছুই নয়, আরো কত কত বলতে পারি ইচ্ছে করলে।"

অ্যালিস বললে, "দয়া করে সে-কষ্ট আর করবেন না, অনুরোধ করছি।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "না, না, কষ্ট আবার কী? এতক্ষণ যা যা বলেছি, সব উপহার দিলাম তোমায়।"

অ্যালিস মনে মনে ভাবলে 'কী উপহারেরই ছিরি! ভাগ্যিস জন্মদিনে

কেউ এইরকম উপহার দেয় না!' কথাগুলো চেঁচিয়ে বলবার ভরসা হল না।

আবার অ্যালিসের কাঁধে থুতনির খোঁচা মেরে জমিদারগিন্নী বললেন, "আবার ভাবছ ?"

অ্যালিসের তখন একটু একটু বিরক্ত লাগতে শুরু করেছে। ফট্ করে বলে দিলে, "বেশ করব ভাবব, ভাববার অধিকার আছে আমার।"

জমিদারগিন্নী বললেন, "ঠিক কথাই বলেছ, যেমন শুয়োরদের ওড়বার অধিকার আছে। আর এর নী—"

জমিদারগিন্নীর কথা আস্তে আস্তে থেমে গেল দেখে অ্যালিস তো অবাক ; তাঁর এত সাধের 'নীতি-উপদেশ' কথাটা শেষপর্যন্ত পুরো উচ্চারণ করলেন না, আর তাঁর হাতটাও অ্যালিসের হাতের ওপর আলগা হয়ে গেল। মুখ তুলতেই দেখলে, সামনে স্বয়ং মহারানী ; হাতে-হাতে জড়িয়ে বুকের ওপর রেখেছেন, চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে।

খুব মিন্‌মিনে গলায় ভয়ে ভয়ে জমিদারগিন্নী বললেন, "ভারি সুন্দর দিনটি, মহারানী !"

মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে রানী হুঙ্কার ছাড়লেন, "দেখ, খুব সাবধান, বলে দিচ্ছি, হয় তুমি কেটে পড়, নইলে তোমার মাথাটাকে কেটে পড়তে হবে। যে-কোনো একটা বেছে নাও !"

জমিদারগিন্নী একটা বেছে নিলেন—চোখের পলকে সেখান থেকে হাওয়া।

রানী অ্যালিসকে বললেন, "চল, খেলা চালানো যাক।" অ্যালিস বেচারির কোনো কথা বলবার সাহস হল না, তাঁর পেছন-পেছন খেলার মাঠের দিকে এগোল।

রানী এতক্ষণ ছিলেন না, সেই সুযোগে অতিথিরা সব ছায়ায় বসে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল ; রানীকে আসতে দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আবার খেলা শুরু করে দিলে—রানী শুধু বলেছিলেন যে, এক মুহূর্ত দেরি হলেই তাদের কারোরই প্রাণ থাকবে না।

যতক্ষণ তারা খেলছে, সারাক্ষণই রানী তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলেছেন, আর, 'একে কোতল কর', 'ওকে কোতল কর', বলে চেঁচাচ্ছেন। যাদের প্রাণদণ্ডের হুকুম হচ্ছে, সৈন্যরা তাদের বন্দী করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে,

এবং তার জন্যে তারা খিলেন হয়ে থাকতে পারছে না ; কাজেই আধ ঘণ্টাটাক বাদেই দেখা গেল, মাঠে একটাও খিলেন নেই, আর রাজা, রানী আর অ্যালিস ছাড়া বাকি সবাই প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়ে সৈন্যদের হাতে বন্দী।

রানীর তখন দম বেরিয়ে গেছে, খেলার পাট চুকিয়ে অ্যালিসকে বললেন, "নকল কাছিম দেখা হয়েছে ?"

অ্যালিস বললে, "না, নকল কাছিম কী, তাই-ই জানি না।"

রানী বললেন, "ঐ দিয়েই নকল কাছিমের স্যুপ তৈরি হয়।"

অ্যালিস বললে, "কখনো দেখিনি, শুনিওনি কখনো।"

রানী বললেন, "তা হলে চল, যাওয়া যাক। ও তোমাকে ওর নিজের ইতিহাস বলবে।"

রানীর সঙ্গে যেতে যেতে অ্যালিস শুনতে পেলে, সবাইকে উদ্দেশ্য করে রাজা খুব নিচু গলায় বলছেন, "তোমাদের সব্বাইকে মাফ করে দেওয়া হল।" শুনে অ্যালিস মনে মনে বললে, 'যাক্, ভালো হল।' রানী এত লোকের গর্দান নেবার হুকুম দিয়েছেন দেখে তার খুব খারাপ লাগছিল এতক্ষণ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা গ্রাইফনের কাছে এসে পৌঁছল ; গ্রাইফন তখন রোদ পোহাতে পোহাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। (গ্রাইফন কী, যদি জানা না-থাকে, ছবি দেখে নাও।) রানী বললেন, "উঠে পড়্, কুঁড়ের বাদশা কোথাকার ! এই খুকুমণিকে নিয়ে যা, নকল কাছিম দেখিয়ে আন্, তার গল্প শুনিয়ে আন্। আমি আবার গিয়ে দেখি, যে-সব গর্দান নেবার হুকুম দিলুম, তার কদ্দূর কী হল।" বলে তিনি চলে গেলেন, একা গ্রাইফনের কাছে রয়ে গেল অ্যালিস। গ্রাইফনের ছিরি-ছাঁদ মোটেই ভালো ঠেকছে না অ্যালিসের কাছে, তবে সব দিক ভেবে-চিন্তে দেখলে যে, ঐ বোম্বেটে রানীর সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে গ্রাইফনের কাছে থাকাটা কিছু বেশি বিপজ্জনক হবে না ; কাজেই অপেক্ষা করতে লাগল।

গ্রাইফন উঠে বসে চোখ কচলালে, তার পর যতক্ষণ না রানী চোখের আড়াল হলেন, ততক্ষণ তাঁর যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল, তারপর ঠোঁট টিপে মুচকে হাসলে। কিছুটা অ্যালিসকে লক্ষ করে, কিছুটা নিজের খেয়ালে বললে, "বেড়ে মজার ব্যাপার !"

অ্যালিস বললে, "কী মজার ব্যাপার ?"

গ্রাইফন বললে, "স্বয়ং মহারানী। সবটাই ওঁর কল্পনার খেয়াল, ঐ-যে, ঐ-সব ; কেউ কারো গর্দান নেয় না, জান ?—যাক্, চলে এস !"

আস্তে আস্তে গ্রাইফনের সঙ্গে যেতে যেতে অ্যালিস ভাবতে লাগল, 'সব্বাই এখানে খালি বলে, 'চলে এস' ! জীবনে কখনো এত হুকুম শুনতে হয়নি আমায়, কক্ষনো না।'

বেশি দূর যেতে হল না, দেখা গেল, খানিকটা দূরে নকল কাছিম বেচারির মতো একলাটি বসে রয়েছে একটা সমান মতো পাথরের চাঁইয়ের ওপরে। কাছে আসতে তার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ কানে এল ; শুনে অ্যালিসের মনে হল নকল কাছিমের বুকটা ফেটে না-যায়। বড্ডো মায়া লাগল তার জন্যে। গ্রাইফনকে জিগেস করলে, "কিসের এত দুঃখু ওর ?" গ্রাইফন প্রায় আগের ভাষাতেই জবাব দিলে, "সবটাই ওর কল্পনার খেয়াল, ঐ-যে, ঐ-সব ; ওর কোনো দুঃখু নেই, জানলে ? চলে এস।"

ওরা নকল কাছিমের কাছে গিয়ে পেঁাছল। নকল কাছিম জল-ভরা বড়ো-বড়ো দুটি চোখ মেলে তাকাল ওদের দিকে, কোনো কথা বললে না।

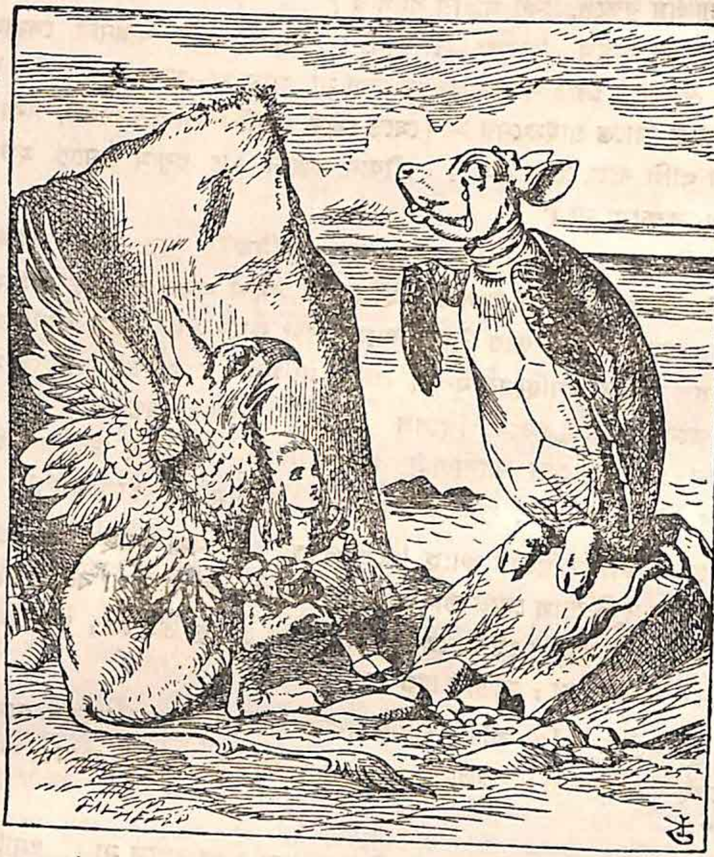
গ্রাইফন বললে, "এই যে ছোটো মেয়েটিকে দেখছ, এই যে ; ও তোমার ইতিহাস শুনতে চায় ; সত্যিই চায়।"

খুব গভীর কাঁপা কাঁপা গলায় নকল কাছিম বললে, "বলব ওকে। দুজনেই বস তোমরা। আমার বলা শেষ না হলে একটি কথাও কয়ো না।"

ওরা বসল, কয়েক মিনিট কেউ-ই কোনো কথা বললে না। অ্যালিস মনে মনে বললে, 'আরম্ভ না-করলে শেষ করবে কী করে রে বাবা !' তবে ধৈর্য ধরে বসে রইল।

শেষ-মেশ ফোঁস্ করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে নকল কাছিম বললে, "একদিন আমি সত্যিকারের কাছিম ছিলাম।"

এর পর অনেকক্ষণ আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু গ্রাইফনের গলা দিয়ে আবেগের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—"হজ্‌কর্‌হ !" আর, তার সঙ্গে নকল কাছিমের অবিরাম ফোঁপানির ফোঁৎ ফোঁৎ। অ্যালিস ভাবছে, 'ধন্যবাদ, স্যার, চমৎকার গল্প শুনিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ' বলে উঠে পড়ে ; কিন্তু আবার ভাবছে, নিশ্চয়ই এর পরে কিছু আছে। তাই কোনো কথা না-বলে চুপটি করে বসে রইল।



শেষপর্যন্ত নকল কাছিম আবার যখন বলতে শুরু করল, তখন মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠলেও, অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে—"যখন আমরা ছোটো ছিলাম, তখন সুমুদ্দুরে ঝাঁক বেঁধে পড়তে যেতাম। মাস্টার ছিলেন এক বুড়ো কাছিম—আমরা তাঁকে বলতাম, কূর্ম—কুর্‌মোমশাই।"

অ্যালিস প্রশ্ন করলে, "তিনি যদি কূর্ম না-হন, তা হলে তাকে কূর্মমশাই বলতে কেন ?"

নকল কাছিম রাগের গলায় বললে, "তাঁকে কুর্‌মোমশাই বলতুম এই জন্যে যে, তিনি আমাদের পড়াতেন, আমদের গুর্‌মোমশাই ছিলেন, তাই। তুমি বড্ডো হাঁদা দেখছি!"

গ্রাইফন ফোড়ন কাটলে, "এইরকম বোকার মতন প্রশ্ন করার জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।" তারপর দুজনে চুপ করে বসে

বসে বেচারি অ্যালিসের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যে, অ্যালিসের মনে হল মাটির নিচে সেঁধিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। শেষকালে গ্রাইফন নকল কাছিমকে বললে, "চালিয়ে যাও দোস্ত্ ! দিন কাবার করে দিয়ো না !" নকল কাছিম বলতে শুরু করলে ঃ

"হ্যাঁ, সুমুদ্দুরের ইস্কুলে যেতাম ; বিশ্বাস না-করলে কী করব বল—"

অ্যালিস বাধা দিয়ে বললে, "বিশ্বাস করি না, বলেছি কি ?"

নকল কাছিম বললে, "হ্যাঁ, বলেছ।"

অ্যালিস কিছু বলবার আগেই গ্রাইফন বলে উঠল, "খামোশ !"

নকল কাছিম বলে যেতে লাগল, "খুব ভালো শিক্ষা পেতাম আমরা — সত্যি কথা বলতে কি, রোজই ইস্কুলে যেতাম—"

অ্যালিস বললে, "আমিও ইস্কুলে পড়েছি, অত চাল মারবার কিছু নেই।"

নকল কাছিম একটু ভাবনায় পড়ল ; বললে, "'অধিকন্তু' বিষয় নিয়ে ?"

অ্যালিস বললে, "অবশ্যই। আমরা ফরাসী ভাষা আর সঙ্গীত শিখতাম।"

নকল কাছিম বললে, "আর ধোলাই ?"

অ্যালিস চটে উঠে বললে, "নিশ্চয়ই না।"

হাঁফ ছেড়ে নকল কাছিম বললে, "অ্যাই ! তার মানে তোমাদের ইস্কুলটা তেমন ভালো নয়। আমাদের ওখানে লিস্টির তলায় লেখা থাকত, 'ফরাসী ভাষা, সঙ্গীত এবং ধোলাই—অধিকন্তু'।"

অ্যালিস বললে, "সুমুদ্দুরের তলায় তোমার ধোলাইয়ের তেমন দরকারটাই-বা কী হত।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নকল কাছিম বললে, "সেটা আর শেখা হয়ে উঠল না আমার, শুধু সাধারণ মামুলি বিষয়গুলো নিয়েই পড়েছিলাম।"

অ্যালিস জিগেস করলে, "সেগুলো কী ?"

নকল কাছিম উত্তর দিলে, "প্রথমে ধর, ধপ্ করে পড়া আর হাতের ঠেকা, তারপর ধর গণিতের সব বিভিন্ন ব্যাপার—'রৈখিক নিয়ম,' 'কুটিল মগ্নাংশ,' 'খড়গমূল,' আর 'বমিকরণ' !"

অ্যালিস বুক ঠুকে বলে ফেললে, "বমিকরণ বলে কোনো কথা শুনিনি। মানে কী ?"

গ্রাইফন অবাক হয়ে দুটো থাবাই একসঙ্গে তুলে ফেললে।

সবিস্ময়ে বললে, "অ্যাঁ ? বমিকরণ শোননি কখনো ? বশীকরণ কাকে বলে জান নিশ্চয়ই ?"

অ্যালিস একটু আম্‌তা-আম্‌তা করে বলেন, "বশীকরণ মানে—মানে—কাউকে—বশীভূত করা।"

গ্রাইফন বললে, "তা হলে, বুঝতেই পারছ, বমিকরণ মানে বমিভূত করা, অর্থাৎ বমি করা ! এও যদি মাথায় না-আসে, তা হলে তুমি একেবারে বোকার বেহদ্দ !"

আর কিছু জিগেস করতে ভরসা হল না, অ্যালিস তাই নকল কাছিমের দিকে ফিরে বললে, "আর কী কী পড়তে হত ?"

নিজের পাখনায় কড় গুনতে গুনতে নকল কাছিম বললে, "তারপর ছিল 'স্মৃতিনাশ', প্রাচীন এবং আধুনিক ; তারপর তোমার 'উদ্‌গোল' ; তারপর 'ঝঙ্কন',—ঝঙ্কন শেখাতেন একজন বুড়ো বানমাছ, তিনি সপ্তাহে একদিন করে আসতেন ; আমাদের 'ঝঙ্কন' করতে শেখাতেন 'চং' করতে শেখাতেন 'কোঁদন' শেখাতেন।"

অ্যালিস বললে, "সেটা কী রকম ?"

নকল কাছিম বললে, "আমার দ্বারা হবে না, দেহটা বড়ো শক্ত হয়ে পড়েছে। গ্রাইফন তো আবার শেখেইনি।"

গ্রাইফন বললে, "সময় পাইনি ; তার বদলে প্রাচীন ভাষার গুরু-মশাইয়ের কাছে যেতাম, তিনি হলেন বৃদ্ধ এক কাঁকড়া, হ্যাঁ, কাঁকড়াই তো।"

নকল কাছিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, "আমার আর তাঁর কাছে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। শুনতাম তিনি 'চমৎকৃত' আর 'গালি' পড়াতেন।"

এবার গ্রাইফনের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার পালা। "তাই তো পড়াতেন, পড়াতেনই তো।" বলে দুজনেই থাবা দিয়ে মুখ ঢাকলে।

কথা ঘোরাবার জন্যে অ্যালিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "দিনে কতক্ষণ পড়তে ?"

নকল কাছিম বললে, "প্রথম দিন দশ ঘণ্টা, তার পর দিন ন' ঘণ্টা, এই রকম।"

অ্যালিস অবাক হয়ে বললে, "কী অদ্ভুত ব্যবস্থা !"

গ্রাইফন মন্তব্য করলে, "ঐজন্যেই তো ওকে 'পড়া' বলে। দিনে দিনে সময়টা পড়তির দিকে যায় বলেই তো 'পড়া'।"

অ্যালিসের কাছে ব্যাপারটা ভারি নতুন ঠেকল। খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে আবার জিগেস করলে, "তা হলে, এগারো দিনের দিন তো ছুটি থাকত?"

নকল কাছিম বললে, "অবশ্যই থাকত।"

অ্যালিস সাগ্রহে জানতে চাইলে, "বারো দিনের দিন কী ব্যবস্থা হত?"

গ্রাইফন কর্তৃত্বের সুরে বললে, "পড়ার কথা আর নয়, ঢের হয়েছে। এবার খুকিকে খেলাধুলোর কথা কিছু শোনাও-না।"

নকল কাছিম বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "দু সারি! সীলমাছ, তার পর কাছিম, এইভাবে; তারপর যখন জেলিফিশগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে জায়গাটা সাফ করা হয়ে যাবে—"

গ্রাইফন ফোড়ন কাটলে, "এতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে।"

"—তখন, দু পা এগুবে—"

গ্রাইফন চেঁচিয়ে উঠল, "প্রত্যেকে এক-একটা গল্‌দা চিঙ্‌ড়িকে নেবে দোসর হিসেবে।"

নকল কাছিম বললে, "ঠিক তাই, দু পা করে এগিয়ে গিয়ে নিজের দোসরের সঙ্গে জোড় বাঁধবে—"

গ্রাইফন কথাটা শেষ করলে, "তারপর, যে-যার দোসর বদল করে অন্য চিঙ্‌ড়ি মাছের সঙ্গে জোড় বেঁধে যেভাবে এগিয়েছিলে, সেইভাবে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে আসবে।"

নকল কাছিম বলে চলল, "তখন, গল্‌দা চিঙ্‌ড়িগুলোকে—"

গ্রাইফন বোমা ফাটার মতো শব্দ করে বললে, "ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।"

"—সুমুদ্দুরের জলে যত দূরে পার—"

গ্রাইফন তারস্বরে বললে, "তারপর তাদের পেছন পেছন সাঁতরাতে থাকবে!"

নকল কাছিম ক্ষ্যাপার মতো ধেই ধেই করে নেচে বেড়াতে বেড়াতে বললে, "তারপর, সুমুদ্দুরের জলে ডিগবাজি খাবে।"

গ্রাইফন গলা ফাটিয়ে বললে, "আবার গল্‌দা চিঙ্‌ড়ি বদল করবে।"

নকল কাছিম বললে, "এবার ডাঙায় ফিরে এস; ব্যস, জোড়-বিজোড় নাচের প্রথম অঙ্ক এখানেই শেষ।" হঠাৎ তার স্বরটা নিচু হয়ে গেল। গ্রাইফন আর সে এতক্ষণ পাগলের মতো লাফিয়ে-দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, এখন আবার খুব দুঃখু দুঃখু ভাব নিয়ে বসে বসে অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে রইল চুপচাপ।

অ্যালিস ভয়ে ভয়ে বললে, "নাচটা তো খুব চমৎকার বলেই মনে হচ্ছে।"

নকল কাছিম বললে, "একটু নমুনা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না-কি?"

অ্যালিস বললে, "খুব ইচ্ছে হচ্ছে।"

নকল কাছিম গ্রাইফনকে বললে, "এস, নাচের প্রথম ফেরটা

দশম পরিচ্ছেদ

গল্‌দা চিঙড়ির জোড়-বিজোড় নাচ

নকল কাছিম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাখনা-পানা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ-টোখ মুছে অ্যালিসের দিকে চেয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ফোঁপানির জন্যে মিনিট দুয়েক তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল না। গ্রাইফন বললে, "গলায় হাড় আটকে গেলে যেমন হয়, তেমনি হয়েছে ওর।" বলে তাকে ঝাঁকুনি দিতে আরম্ভ করে দিলে, পিঠে থাবড়া মারতে লাগল। শেষ অবধি নকল কাছিমের গলায় স্বর ফুটল। দু গাল ভাসিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আবার শুরু করলে ঃ

"সুমুদ্দুরের তলায় হয়তো কখনো বেশি দিন তুমি থাকনি—" (অ্যালিস বললে, "না, থাকিনি।") "আর, গল্‌দা চিঙ্‌ড়ির সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগও পাওনি কখনো—" (অ্যালিস বলতে যাচ্ছিল, "একবার চেখে দেখেছি—" কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, "মোটেই না।") —"গল্‌দা চিঙ্‌ড়ির জোড়-বিজোড় নাচ যে কী চমৎকার, সে-সম্বন্ধে তোমার তো কোনো ধারণাই নেই।"

অ্যালিস বললে, "তা তো নেই-ই। কী ধরনের নাচ?"

গ্রাইফন বললে, "ধর, প্রথমে সমুদ্রের কূল-বরাবর সার বেঁধে দাঁড়াতে হয়—"

নেচে দেখা যাক। গল্দা চিঙ্ড়ি না-থাকলেও চলবে, বুঝলে? কে গাইবে?"

গ্রাইফন বললে, "তুমিই গাও, আমার কথা-টথা মনে নেই!"

তখন তারা খুব নিবিষ্ট মনে অ্যালিসের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করে দিলে, আর তার খুব কাছ-ঘেঁষে নাচবার সময়ে তার পা মাড়িয়ে দিতে লাগল, ওপরের থাবা নেড়ে নেড়ে তাল দিতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে নকল কাছিম খুব করুণভাবে ধীরে ধীরে গাইলে—



"আরো তাড়াতাড়ি পা চালাও ভাই," খয়রা বললে শামুকে,
"পেছনে শুশুক কেবলই ধাক্কা মারছে ল্যাজের কাছেতে।
দেখ-না, গল্দা, কাছিমেরা সব এগিয়ে গিয়েছে সমুখে—
পাড়ে গ্যাছে তারা—যাবে কি সেখানে? যোগ দেবে সেই নাচেতে?"

যাবে কি যাবে না, যাবে কি যাবে না, যোগ কি দেবে না নাচেতে?
যাবে কি যাবে না, যাবে কি যাবে না, যোগ কি দেবে না নাচেতে?

"ভাবতে পার না, কতই যে ভালো লাগবে তোমার তখন—
আমাদের ধরে তুলে তুলে ওরা ছুঁড়ে ফেলে দেবে যখন !"
শামুক বলিল, "বহু দূর পথ !" সাধুবাদ দিল মাছে ;
অপাঙ্গে চেয়ে জানাল তাহারে—যোগ দেবে না সে নাচে।

দেব না, পারব না, দেব না, পারব না, যোগ দেব নাকো নাচে।
দেব না, পারব না, দেব না, পারব না, যোগ দেব নাকো নাচে।

খয়রা-বন্ধু বলিল, "যতই দূর পথ হোক, ক্ষতি নেই,
আরো এক কূল আছে ঐ পারে, ঠিক আমাদের পিছনেই।
ইংলণ্ড থেকে যত দূরে যাবে, ফ্রান্স হবে তত কাছেতে,
ভয় পেয়ো নাকো, প্রিয় সখা মোর, চল, যোগ দাও নাচেতে !"

যাবে কি যাবে না, যাবে কি যাবে না, যোগ কি দেবে না নাচেতে ?
যাবে কি যাবে না, যাবে কি যাবে না, যোগ কি দেবে না নাচেতে ?

অ্যালিস মুখে বললে, "ধন্যবাদ, নাচটা দেখতে খুব ভালো লাগল," মনে মনে ভাবলে—থেমেছে, না বেঁচেছি !—"আর খয়রা মাছের ঐ অদ্ভুত গানটাও তেমনি সুন্দর !"

নকল কাছিম বললে, "খয়রা মাছের কথাই যদি তুললে, তা হলে বলি, ওরা—খয়রা মাছ নিশ্চয়ই দেখেছ ?"

অ্যালিস বললে, "হ্যাঁ, কত বার দেখেছি খাবা—" তারপর বাকিটুকু শেষ না করেই সামলে নিলে।

নকল কাছিম বললে, "খাবা জায়গাটা ঠিক কোথায়, জানা নেই, তবে যদি কত বারই দেখে থাক, তা হলে তো জানই ওদের দেখতে কেমন।"

অ্যালিস ভেবে নিয়ে বললে, "তা বোধ হয় জানি। ল্যাজটা মুখের মধ্যে ঢোকানো থাকে, আর সারা গায়ে পাউরুটির গুঁড়ো খড়্‌খড়্‌ করে !"

নকল কাছিম বললে, "ঐ পাউরুটির গুঁড়োর কথাটা ঠিক নয়, সুমুদ্দুরের জলে ও-সব তো ধুয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, ল্যাজটা মুখের মধ্যেই থাকে ; তার কারণ হল—" বলতে বলতে নকল কাছিম হাই তুলে চোখ বন্ধ করে ফেললে ! গ্রাইফনকে বললে, "কারণ-টারণগুলো বলে দাও তো হে।"

গ্রাইফন বললে, "গল্‌দা চিঙ্‌ড়ির সঙ্গে ওরা নাচতে যাবেই। কাজেই ওদের সুমুদ্দুরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হবেই। তার মানে অনেক দূরে গিয়ে ওদের পড়তে হবেই। কাজেই ওদের ল্যাজগুলো ঠেসে মুখের মধ্যে ঢোকাতে হবেই। কাজেই ওরা ল্যাজটা আর মুখ থেকে বার করতে পারবেই না। এই হল ব্যাপার।"

অ্যালিস বললে, "ধন্যবাদ, ভারি মজার ব্যাপার। খয়রা মাছ সম্বন্ধে এত-সব ব্যাপার কিছুই জানতুম না।"

গ্রাইফন বললে, "যদি চাও, আরো অনেক কথা জানাতে পারি। কেন ওদের খয়রা বলে, জান ?"

অ্যালিস বললে কখনো ভেবে দেখিনি। কেন ?"

গ্রাইফন খুব গম্ভীরভাবে বললে, "জুতো-টুতো পালিশ-টালিশ হয় বলে।"

অ্যালিস ভয়ানক ধাঁধায় পড়ে গেল। অবাক হয়ে গ্রাইফনের কথাটাই আওড়ালে, "জুতো-টুতো পালিশ-টালিশ হয় বলে ?"

গ্রাইফন বললে, "কেন ? তোমার জুতো পালিশ কর কী দিয়ে ? মানে, কিসের দৌলতে তোমার জুতো চক্‌ চক্‌ করে ?"

অ্যালিস তার পায়ের জুতো-জোড়াটা দেখে নিয়ে একটু ভেবে বললে, "আমার তো মনে হয় কালো পালিশ দিয়ে।"

ভারী গলায় গ্রাইফন বললে, "সুমুদ্দুরের তলায় খয়েরি রঙ দিয়ে জুতো পালিশ করা হয়। এবার হল তো ?"

অ্যালিস খুব কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলে, "জুতোগুলো কী দিয়ে তৈরি ?"

গ্রাইফন বেশ একটু বিরক্ত হয়েই জবাব দিলে, "শোল আর হিল্‌-সা দিয়ে। কুচো চিঙ্‌ড়িও এ কথা জানে।"

গ্রাইফন হঠাৎ অ্যালিসকে বললে, "এবার তোমার কথা কিছু শোনাও দিকিনি।"

অ্যালিস একটু ভয়ে ভয়েই বললে, "আজ সকাল থেকে যে-সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, সেগুলো তোমাদের বলা যেতে পারে, কিন্তু গত কালের কথা শুনিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ তখন আমি অন্য মানুষ ছিলাম।

নকল কাছিম বললে, "বেশ করে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে বল।"

গ্রাইফন অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, "না, না ! আগে ওর অদ্ভুত ঘটনার কথা শোনা যাক। ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যায় বড্ডো সময় নেয়।"

সেই সাদা খরগোশের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে শুরু করল অ্যালিস। ওরা দুজন ওর দুপাশে এমন ঘেঁষে এসে বসল আর ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে, আকাশ-পাতাল হাঁ করে এমনভাবে ওর কথা শুনতে লাগল যে, প্রথমটায় কেমন গা শির্শির্ করতে লাগল, তার পরে অবশ্য ভরসা গেল। সারাক্ষণই বেশ চুপচাপ ছিল ওরা, কিন্তু শোঁয়াপোকাকে সেই বুড়োর কবিতাটা শোনাতে গিয়ে কথাগুলো কেমন সব ভুল-ভাল হয়ে গেল, সেই জায়গাটা যখন শোনাচ্ছে, তখন নকল কাছিম খুব লম্বা একটা নিশ্বাস টেনে বললে, "ভারি অদ্ভুত তো!"

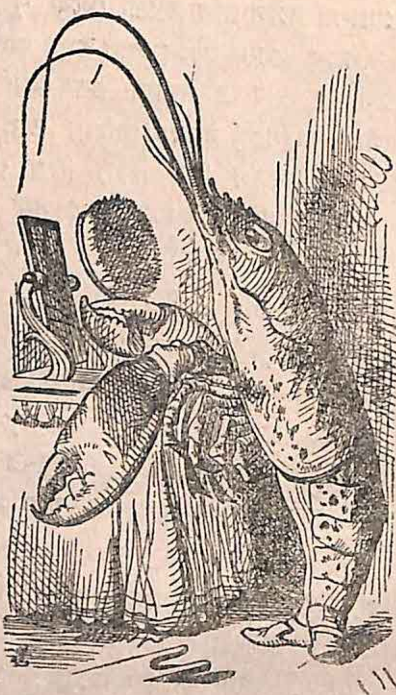
গ্রাইফন বললে, "যদ্দূর অদ্ভুত হতে পারে।"

নকল কাছিম চিন্তার সুরে বললে, "সমস্তটা অন্যরকম হয়ে গেল! এখন একটা কিছু যদি ও মুখস্থ বলে, তো শুনে দেখি। ওকে কিছু একটা শুরু করতে বল তো।" গ্রাইফনের দিকে চেয়ে এমন-ভাবে কথাটা বললে, যেন অ্যালিসের ওপর তার কর্তৃত্বের অধিকার আছে।

গ্রাইফন বললে, "উঠে দাঁড়াও, সেই কবিতাটা বল—'স্বর শোনা যায়—'।"

অ্যালিস ভাবলে, 'আশ্চর্য! সবাই কেবল হুকুম করছে, আর কবিতা আওড়াতে বলছে। তার চেয়ে ইস্কুলে গেলেই হয়।' যাই-হোক, উঠে দাঁড়িয়ে কবিতা বলতে শুরু করলে, কিন্তু তার মাথায় সেই গলদা চিঙ্ড়ির নাচের কথাটা এমন চেপে বসে আছে যে, কী বলছে, তা খেয়ালই রইল না; উদ্ভট উদ্ভট সব কথা বেরতে লাগল তা মুখ দিয়ে:

'স্বর শোনা যায় চিঙ্ড়ি মাছের, কান পেতে তাই শুনি:
"বড্ডো কড়া ভাজলে আমায়, চুলে লাগাই চিনি।"
হাঁসের যেমন চোখের পাতা, তাহার তেমন নাক,
তাই দিয়ে সে সাফ করে বেল্ট, বোতাম এবং টাক।
বালি যখন শুকনো থাকে, তখন থাকে সুখে,
হাঙর-মাছের নিন্দা সদাই যায় শোনা তার মুখে;
কিন্তু যখন জোয়ার আসে, হাঙর আসে ফিরে,
তখন ভয়ে গলার আওয়াজ মিলায় ধীরে ধীরে।"



গ্রাইফন বললে, "ছোটোবেলায় যেরকম বলতাম মোটেই তার সঙ্গে মিলছে না।"

নকল কাছিম বললে, "আগে অবশ্য কখনো শুনিনি, তবে অসাধারণ আবোল-তাবোল শোনাচ্ছে।"

অ্যালিস কোনো কথা বললে না; দুহাতের ওপর মুখ রেখে ভাবতে লাগল, কোনো দিন কী আর স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছু ঘটবে!

নকল কাছিম বললে, "আমি চাই, পুরোটা ব্যাখ্যা করে বোঝান হোক।"

গ্রাইফন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা ও করতে পারবে না। তুমি বরং পরের চরণটা বল।"

নকল কাছিম বললে, "কিন্তু টাক? নাক দিয়ে সে টাক সাফ করবে কী করে?"

অ্যালিস বললে, "নাচের একটা মুদ্রা আর কি।" কিন্তু নিজেরই কেমন ধাঁধা লাগল, তাই অন্য কথা পাড়তে চাইলে।

গ্রাইফন আবার বললে, "কবিতার পরের চরণগুলো বল-না। শুরুটা হচ্ছে এইরকম : 'তার বাগানে...'।"

হুকুম অমান্য করতে অ্যালিসের ভরসা হল না, অথচ বেশ বুঝতে পারলে যে, প্রত্যেকটা কথাই ভুল হবে, তাই কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করলে :

'তার বাগানের পাশ দিয়ে যেতে, দেখি এক চোখ দিয়ে,
প্যাঁচা আর চিতা ব্যস্ত রয়েছে পিঠে ভাগাভাগি নিয়ে।
চিতা অনায়াসে গোটা পিঠেটাই তার ভাগে নিলে টানি,
ভাগীদার হয়ে প্যাঁচা পেল শুধু শূন্য সে-ডিশখানি।
খাওয়া শেষ হলে দয়াবান চিতা দেখালে করুণা তার—
ফাউ হিসাবেতে প্যাঁচা পেয়ে গেল চামচেটা উপহার।
চিতাবাঘ নিলে কাঁটা-চামচেটা, নিয়ে নিলে ছুরিটাও,
শেষ করে দিলে ভোজনপর্ব—'

নকল কাছিম বাধা দিয়ে বলে উঠল, "ব্যাখ্যাই যদি না করলে, তা হলে এ-সব মুখস্থ বলে যাওয়ার কী কোনো মানে হয়? এমন দারুণ গোলমেলে জিনিস আমি তো বাপের জন্মে শুনিনি!"

গ্রাইফন বললে, "হ্যাঁ, আমিও তাই বলি, ও-সব বাদ দেওয়াই ভালো।" অ্যালিস তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

গ্রাইফন তখনো বলে চলেছে, "তার চেয়ে সেই গল্‌দা চিঙ্‌ড়ির জোড়-বিজোড় নাচের আর একটা ফের নেচে দেখাব? না-কি, নকল কাছিমের একটা গান শুনবে?"

অ্যালিস সাগ্রহে বললে, "খুব ভালো কথা, নকল কাছিম যদি দয়া করে শোনান, তা হলে গানই শুনি।" অ্যালিসের উৎসাহ দেখে গ্রাইফন বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েই বললে, "হুম্! বলিহারি পছন্দ! ওহে সেই 'কাছিমের স্যুপ'-এর গানটা শুনিয়ে দাও তো!"

নকল কাছিম একটা মস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুরু করলে—মাঝে মাঝেই কান্নায় তার গলা বুজে যেতে লাগল—

'অতি মনোহর স্যুপ সে সবুজ
সুস্বাদে ভরপুর
হাঁড়ির ভিতরে বিরাজিয়া সবে
করিতেছে লোভাতুর!

এমন ভোজ্য সমুখে ধরিলে
কেবা না-হবে লোলুপ ?
ভোজনের সব সেরা আয়োজন,
অতি মনোহর স্যুপ !
মনো—ওহর স্যু—উপ ।
মনো—ওহর স্যু—উপ !
ভোজন—এর স—অব সেরা,
মনোহর, মনোহর স্যুপ !
মনোহর স্যুপ ! মনোহর স্যুপ !
কে বা ধার ধারে মৎস্যের,
মুর্গি অথবা হংস কিম্বা
মোলায়েম ছাগ-বৎসের ?
কে আছে, যাহারে ভুলাবে না এই
রসনা-লোভন রূপ ?
কে আছে এমন, যেবা সব ফেলে
খাবে না এমন স্যুপ ?
মনো—ওহর স্যু—উপ !
মনো—ওহর স্যু—উপ !
ভোজনে—এর স—অব সেরা,
মনোহর, মনো—হর স্যুপ ?

গ্রাইফন চীৎকার করে উঠল, "আবার গাও, আমরাও গলা মেলাই।" নকল কাছিম সবে আবার শুরু করেছে, এমন সময়ে হঠাৎ দূর থেকে হাঁক শোনা গেল, "বিচার শুরু হচ্ছে—এ !"

"চলে এস !" বলে গ্রাইফন অ্যালিসের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে দৌড়তে লাগল, গানটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাও করলে না।

দৌড়ের চোটে হাঁফাতে হাঁফাতে অ্যালিস বললে, "কিসের বিচার হচ্ছে ?" গ্রাইফন শুধু বললে, "চলে এস !" তারপর আরো জোরে দৌড়তে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে অ্যালিসের কানে এল, বাতাসে ভেসে-আসা সেই করুণ সঙ্গীতের রেশটুকু ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে :

'ভোজনে—এর স—অব সেরা
মনোহর, মনোহর স্যুপ !'

একাদশ পরিচ্ছেদ

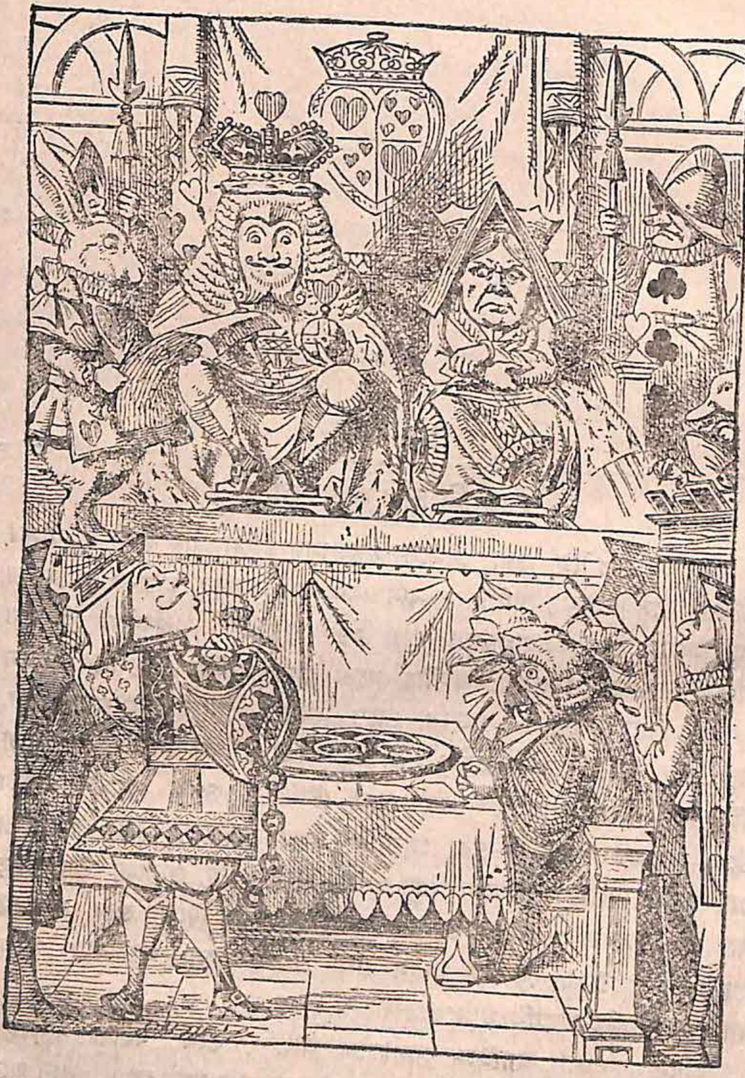
পেরাকি চুরি করল কে ?

সেখানে পেঁৗছে ওরা দেখলে হরতনের রাজা আর রানী সিংহাসন জাঁকিয়ে বসে আছেন, চারিদিকে নানারকম পাখি আর জন্তু-জানোয়ারের ভিড় জমে গেছে, বাহান্নখানা তাস তো আছেই। একদম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোলাম, বন্দীর মতো শেকল-বাঁধা ; দুপাশে দুজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। রাজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই খরগোশটা, তার এক হাতে একটা ভেঁপু, আর-এক হাতে পাকানো একটা বড়ো দলিল। আদালতের ঠিক মাঝখানে টেবিলের ওপর বিরাট একটা ডিশে কয়েকটা চাট্নি-ভরা পেরাকি রাখা রয়েছে ; এত লোভনীয় চেহারা যে, দেখেই অ্যালিসের খিদে চাগাড় দিয়ে উঠল, ভাবলে, 'তাড়াতাড়ি বিচারের পালা শেষ করে খাবারগুলো হাতে হাতে দিতে শুরু করলেই তো হয় !' তেমন কোনো লক্ষণ নেই দেখে, সময় কাটাবার জন্যে অ্যালিস চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

আগে কখনো অ্যালিস আদালতে যায়নি, তবে বইয়ে পড়েছে। প্রায় সব জিনিসের নাম তার জানা, তাই খুব খুশি হল সে। মনে মনে বললে, 'উনি হলেন জজ, কারণ মাথায় পরচুল রয়েছে।'

জজ হয়েছেন রাজা নিজেই ; পরচুলের ওপর মুকুট পরতে হয়েছে বলে বেশ অস্বস্তিতে রয়েছেন তিনি, দেখতেও কিছু একটা খোলতাই হয়নি।

অ্যালিস মনে মনে বললে, 'আর, ঐটা হচ্ছে জুরিদের বসবার জায়গা,



যাকে বলে 'জুরি বক্স', আর ঐ-সব জন্তু-জানোয়ারগুলো হচ্ছে জুরি, (জন্তু-জানোয়ার-না বলে উপায় নেই, কারণ জুরিরা কেউ পশু, কেউ পাখি)। ওদের বোধ হয় বলা উচিত 'জুরিবৃন্দ'।' শেষ কথাটা সে বেশ গর্বের সঙ্গে বার দু-তিন আওড়ালে, কারণ সে জানে যে, তার বয়সী অনেক ছেলেমেয়েই এ-সব কথার মানে জানে না।

বারোজন জুরি খুব ব্যস্ত হয়ে শ্লেটে কী সব লিখে চলেছে। অ্যালিস গ্রাইফনকে জিগেস করলে, "কী করছে ওরা? বিচার শুরু হবার আগে আবার লেখবার কী হল?"

গ্রাইফন তার কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "নিজের নিজের নাম লিখছে, পাছে বিচার শেষ হবার আগে ভুলে যায়।"

অ্যালিস বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করেছে, "যত্ত সব ক্যাবলামি!" এমন সময়ে সাদা খরগোশ চেঁচিয়ে উঠল, "আদালতে আর কোনো কথাবার্তা চলবে না, সব চুপ করুন!" রাজামশাই চোখে চশমা আঁটলেন, তারপর চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলেন কেউ কথা বলছে কিন-না।

জুরিদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে যতটুকু দেখা যায়, তাতে অ্যালিস দেখতে পেলে জুরিরা সবাই তাদের শ্লেটে লিখছে, "যত্ত সব ক্যাবলামি!" আর এও চোখে পড়ল যে, ওদের মধ্যে একজনের আবার, 'ক্যাবলামি' বানানটা ঠিকমতো জানা না থাকায় পাশের জুরিকে জিগেস করে জেনে নিলে। অ্যালিস ভাবলে, 'বিচার শেষ হতে হতে এদের শ্লেটের কী দশাই-না হবে।'

লেখবার সময়ে একজনের পেনসিল থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ বেরচ্ছিল। এই ধরনের শব্দ আবার অ্যালিস একদম সইতে পারে না, তাই সবাইকে পাশ-কাটিয়ে সে সেই জুরির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। খানিক বাদেই সুযোগ বুঝে তার হাতের পেন্সিলটা টপ্ করে তুলে নিলে। এমন ধাঁ করে কাজ সারলে যে, জুরি বেচারা (সেই টিকটিকি—বিল্) কিছু ঠাওর করতে পারলে না; খানিক এদিক-ওদিক হাতড়ে বাধ্য হয়ে তারপর থেকে সারাক্ষণ আঙুল দিয়ে লেখার কাজ চালালে। তাতে অবশ্য লাভ কিছুই হল না, কারণ শ্লেটের গায়ে কোনো দাগই পড়ল না।

রাজা বললেন, "নকীব! অভিযোগ পড়ে শোনাও!"

তাই শুনে ভেঁপুতে তিনবার আওয়াজ তুলে হাতের পাকানো কাগজটা মেলে ধরে খরগোশটা পড়ল—

"মহারানী হরতন, দুপুরে করে যতন
গড়িলেন পেরাকি প্রচুর।
গোলাম তা চুরি করে, ঝটিতে পড়িল সরে
রাজবাড়ি হতে বহু দূর।"

রাজা জুরিদের বললেন, "আপনারা ভেবে চিন্তে এবার রায় দিন।"

খরগোশ বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "এখন নয়, এখন নয়! জুরিদের অভিমত দেবার আগে অনেক সব ব্যাপার-স্যাপার রয়েছে!"

রাজা বললেন, "প্রথম সাক্ষীকে ডাকা হোক।" খরগোশ অমনি ভেঁপুতে তিনবার পোঁ পোঁ আওয়াজ করে, হাঁক পাড়লে, "প্রথম সাক্ষী হাজি—র!"



প্রথম সাক্ষী হল সেই টুপিওলা। একহাতে চায়ের পেয়ালা, আর অন্য হাতে এক টুকরো মাখন-রুটি নিয়ে সে ঢুকল। প্রথমেই বললে, "মাফ করবেন, মহারাজ, এই-সব সঙ্গে নিয়ে এসেছি বলে মাফ করবেন; আমায় যখন ডেকে পাঠানো হল, তখন আমার খাওয়া শেষ হয়নি।"

রাজা বললেন, "শেষ করা উচিত ছিল। শুরু করেছিলে কখন?"

চৈতী খরগোশটাও গেছোইঁদুরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে তার পিছু পিছু আদালতে ঢুকেছে। তার দিকে চেয়ে টুপিওলা বললে, "চোদ্দোই চৈত্র—তাই-ই হবে মনে হচ্ছে।"

চৈতী খরগোশ বললে, "পনেরোই।"

গেছোইঁদুর ফোড়ন দিলে, "ষোলোই।"

রাজা জুরিদের বললেন, "লিখে নিন"। আর সঙ্গে সঙ্গে জুরিরা মন দিয়ে যে-যার শ্লেটে তিনটে তারিখই লিখে ফেললে, সংখ্যা তিনটে যোগ দিলে, তারপর যোগফলটাকে শিলিঙ্‌ আর পেন্স-এ নিয়ে গেল।

রাজা টুপিওলাকে বললেন, "টুপি খোল।"

টুপিওলা বললে, "টুপিটা আমার নয়।"

জুরিদের দিকে ফিরে রাজামশাই গর্জে উঠলেন, "চোরাই মাল!" জুরিরাও অমনি কথাটা টুকে নিলে।

ব্যাপারটা খোলসা করবার চেষ্টা করে টুপিওলা বললে, "আমার সব টুপিই বিক্রির জন্যে, একটাও নিজের জন্যে নয়। আমি টুপিওলা।"

এই সময়ে মহারানী চোখে চশমা এঁটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টুপিওলার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, টুপিওলা ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

রাজা বললেন, "প্রমাণ বাত্‌লাও; আর দ্যাখ, ঘাবড়ে গিয়ে অমন কর না, তা হলে একেবারে এইখানেই তোমাকে জবাই করা হবে।"

এতে সাক্ষী বেচারা ভরসা পেলে বলে মনে হল না; একবার এ-পা, আর একবার ও-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, বারে বারে সন্ত্রস্তভাবে মহারানীর দিকে তাকাতে লাগল, আর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাখন-রুটির বদলে চায়ের পেয়ালা থেকে বেশ বড়ো একটা টুকরো কামড়ে খেয়ে ফেললে।

ঠিক সেই সময়ে অ্যালিস টের পেলে, তার মধ্যে অদ্ভুত একটা কিছু ঘটছে। বেশ ধাঁধায় পড়ে গেল প্রথমটায়, তারপর বুঝতে পারলে যে, আবার সে লম্বা হয়ে যাচ্ছে! গোড়ায় ভাবলে, আদালত থেকে উঠে চলে যায়; তারপরে ঠিক করলে যে, যতক্ষণ জায়গায় কুলোবে, ততক্ষণ সেখানেই থাকবে, নড়বে না।

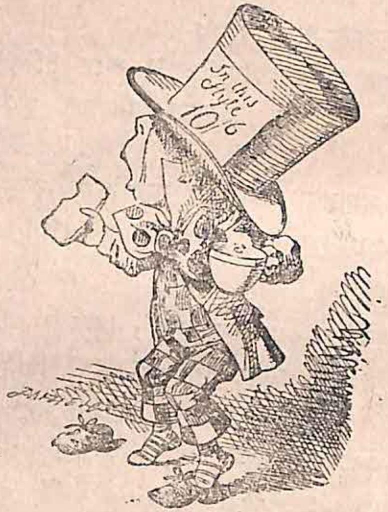
তার পাশে বসেছিল গেছোইঁদুরটা, সে বললে, "আমাকে ওরকম ঠেসে না-ধরলেই নয়! নিঃশ্বাস বন্ধ হবার দাখিল হল যে!"

অ্যালিস খুব নম্রভাবে বললে, "উপায় নেই, আমি বড়ো হয়ে যাচ্ছি।'

গেছোইঁদুর বললে, "তা এখানে কেন? এখানে বাড়াবাড়ি করবার কোনো এক্তিয়ারই নেই তোমার।"

অ্যালিস এবার একটু কড়া হয়েই বললে, "বাজে বকো-না তো, তুমিও তো বাড়ছ, জান না?"

গেছোইঁদুর বললে, "তা বাড়ছি, তবে তার একটা মাত্রা আছে, তোমার মতো উদ্ভূট্টে রকমের নয়।" তারপর চটে-মটে সেখান থেকে উঠে অন্য দিকে চলে গেল।



মহারানী কিন্তু তখনো একদৃষ্টিতে টুপিওলার দিকে তাকিয়ে আছেন। গেছোইঁদুর যখন আদালতের এদিক থেকে ওদিকে গেল, তখন তিনি আদালতের একজন কর্মচারীকে বললেন, "গতবারের জলসায় যারা যারা গান করেছিল, তাদের নামের লিস্টিটা নিয়ে এস।" শুনে টুপিওলা বেচারি এমন থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল যে দুটো জুতোই খসে পড়ল তার পা থেকে।

রাজা খুব রেগে আবার বললেন, "প্রমাণ দাখিল কর, নাহলে তোমায় জবাই করা হবে, ঘাবড়ে গেলেও হবে, না-গেলেও হবে।" টুপিওলা কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করলে, "আমি বড়ো গরিব, মহারাজ—তখনো চা খেতে শুরুই করিনি—হপ্তাখানেকের বেশি হবে

না—তা ছাড়া, রুটি-মাখন ক্রমশই বড়ো পাতলা-পাতলা হয়ে যাচ্ছিল—তারপর চায়ের চমকানি—"

রাজা বললেন, "কিসের চমকানি ?"

টুপিওলা বললে, "আজ্ঞে, চমকানিটার সূত্রপাত হল চায়ে।"

রাজামশাই খ্যাঁক করে উঠলেন, "চমকানির সূত্রপাত 'চা' নয় 'চ' দিয়ে ! আমায় কি বুদ্ধু পেয়েছ না-কি ? তারপর বলে যাও।"

টুপিওলা বলতে লাগল, "আমি, বড়ো গরিব ; তারপর থেকে প্রায় সমস্ত কিছুই চমকে উঠতে লাগল—কেবল চৈতী খরগোশ বললে—"

চৈতী খরগোশ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল, "মোটেই আমি বলিনি !"

টুপিওলা বললে, "হ্যাঁ বলেছ !"

চৈতী খরগোশ বললে, "আমি অস্বীকার করছি !"

রাজা বললেন, "ও অস্বীকার করছে, এ-প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হোক।"

টুপিওলা বললে, "বেশ, তা হলে না হয়, গেছোইঁদুরই বললে—"

বলতে বলতে খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘুরে দেখে নিলে গেছোইঁদুরটাও আবার অস্বীকার করে কি-না ; তবে গেছোইঁদুর কোনো কিছুই অস্বীকার করলে না, কারণ সে তখন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে।

টুপিওলা বলে যেতে লাগল, "তারপর, আমি আরো কটা রুটি কেটে নিয়ে মাখন লাগালুম—"

একজন জুরি প্রশ্ন করলে, "কিন্তু, গেছোইঁদুর কী বললে ?"

টুপিওলা বললে, "ভুলে গেছি।"

রাজা বললেন, "মনে কর, নইলে গর্দান যাবে।'

চায়ের পেয়ালা, আর-মাখন-রুটি খসে পড়ে গেল বেচারা টুপিওলার হাত থেকে, এক পা ভেঙে হাঁটুগেড়ে বললে, "আমি বড়োই গরিব মহারাজ ! বড্ডো টানাটানি আমার !"

রাজা বললেন, "কথাবার্তায় তোমার যে খুবই টানাটানি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।"

এই সময়ে একটা গিনিপিগ্ বাহবা দিয়ে চীৎকার করে উঠতেই আদালতের কর্মচারীরা তাদের অবদমন করল। ('অবদমন কথাটা বড্ডো কড়া, তাই খুলে বলি, কী ভাবে সেটা করা হল : কর্মচারীদের কাছে ছিল মস্ত একটা ক্যাম্বিসের থলে, তার মুখে দড়ি বাঁধা ; ওরা

গিনিপিগ্‌টাকে মাথা নিচু করে তার মধ্যে পুরে দিয়ে থলেটার ওপর চেপে বসে রইল।)

অ্যালিস ভাবলে, 'কাগজে প্রায়ই দেখেছি, লেখা থাকে, বিচারের শেষে 'চেঁচিয়ে বাহবা দেবার প্রয়াস দেখা যাইতেই আদালতের কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ তাহা অবদমন করিলেন' ; কিন্তু আগে তার মানে বুঝতে পারতুম না। এখন ভাগ্যিস চোখের সামনেই দেখতে পেলুম।'

রাজা টুপিওলাকে তখন বলছেন, "এ ছাড়া আর কিছু যদি তোমার জানা না-থাকে, তা হলে নেমে দাঁড়াতে পার।"

টুপিওলা বললে, "মাটিতেই দাঁড়িয়ে আছি, আর কোথায় নামব ?"

রাজা বললেন, "তা হলে বসে পড়তে পার।"

এই সময়ে অন্য-সব গিনিপিগ্‌রা চেঁচিয়ে বাহবা দিয়ে উঠতেই, তাদেরও অবদমন করা হল।

অ্যালিস ভাবলে, 'যাক, গিনিপিগের পালা শেষ! এবার নিশ্চিন্তে কাজ এগোবে।'

রানী জলসার গাইয়েদের নামের লিস্টি পড়ছিলেন, আশঙ্কাভরা চোখে তাঁর দিকে দেখে নিয়ে টুপিওলা বললে, "আমি বরং চা-টা শেষ করি।"

রাজা বললেন, "তুমি যেতে পার।" আর সঙ্গে সঙ্গে টুপিওলা এক দৌড়ে আদালতের বাইরে ; জুতো পরবারও তর সইল না।

রাজার কথার খেই ধরে রানী সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্মচারীকে বললেন, "বাইরে গিয়ে ওর গর্দানটা নিয়ে নাও গে।" কিন্তু কর্মচারীটি, দরজার কাছে পেঁছতে না-পেঁছতেই টুপিওলা হাওয়া হয়ে গেছে।

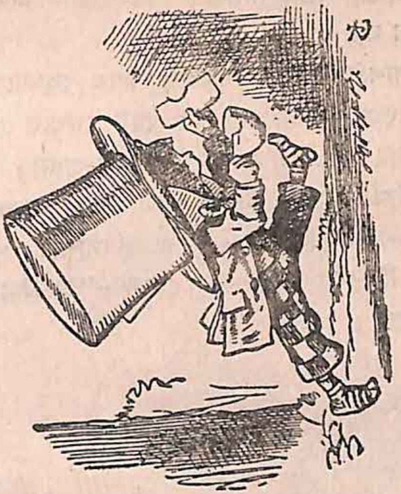
রাজা বললেন, "পরের সাক্ষীকে ডাক !"

পরের সাক্ষী হল জমিদারগিন্নীর রাঁধুনী। তার হাতে মরিচের কৌটো রয়েছে। সে আদালতে ঢোকবার আগেই, দরজার কাছাকাছি যারা ছিল, তাদের সবাইকে একসঙ্গে হাঁচতে শুনে অ্যালিস বুঝতে পারলে যে, তিনিই আসছেন।

রাজা বললেন, "তোমার সাক্ষ্য দাও।"

রাঁধুনি বললে, "দেব না।"

রাজা চিন্তাকুলভাবে সাদা খরগোশের দিকে তাকাতেই সে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "মহারাজ, মহারাজ, একে জেরা করা দরকার।"



খুব করুণ গলায় রাজা বললেন, "তা যদি করতেই হয়, তো করব।" তারপর বুকের ওপর দুহাত বগল-দাবা করে রাধুনীর দিকে এমন ভুরু কুঁচকে তাকাতে লাগলেন যে, শেষপর্যন্ত তাঁর চোখদুটো ভুরুর তলায় ঢাকা পড়ে গেল। তখন বললেন, "পেরাকি তৈরি হয় কী দিয়ে?"

রাঁধুনী বললে, "প্রধানত মরিচ দিয়ে।"

তার পেছন থেকে অমনি ঘুমঘুম গলায় আওয়াজ এল, "ঝোলা গুড় দিয়ে।"

রানী চীৎকার করে বললেন "গেছোইঁদুরটার গলায় বকলস পরিয়ে দাও, গেছোইঁদুরকে কোতল কর! গেছোইঁদুরকে আদালত থেকে দূর করে দাও। ওকে অবদমন কর। ওকে চিমটি কাট! ওর গোঁফ ছেঁটে দাও!

গেছোইঁদুরকে আদালত থেকে বার করবার সময়ে কয়েক মিনিট ধরে সারা আদালত জুড়ে হট্টগোল চলতে লাগল, তারপর আবার যখন সব শান্ত হল, তখন দেখা গেল রাঁধুনীর কোনো পাত্তা নেই।

হাঁফ ছেড়ে বেশ নিশ্চিন্ত গলায় রাজা বললেন, "যাক্ গে মরুক গে, এর পরের সাক্ষীকে ডাক।" সঙ্গে সঙ্গে নিচু গলায় মহারানীকে বললেন,

"সত্যি বলছি গো, এর পরের সাক্ষীকে তুমিই জেরা ক'র। জেরা করলে আমার মাথা ধরে যায়!"

সাদা খরগোশটা নামের লিস্টিতে চোখ বোলাতে বোলাতে মাঝে মাঝে থম্‌কে পড়ছে, আর, অ্যালিস তাই দেখতে দেখতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ভাবছে যে, পরের সাক্ষীটি কেমন হবে কে-জানে; ভাবছে, 'এখনো পর্যন্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশেষ কিছুই তো পাওয়া গেল না।' এমন সময়ে—কী আর বলব তোমাদের—সাদা খরগোশটা তার সরু একরত্তি গলায় প্রাণপণে চিৎকার করে হাঁক দিলে—"অ্যালিস!" অ্যালিস তো আকাশ থেকে পড়ল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

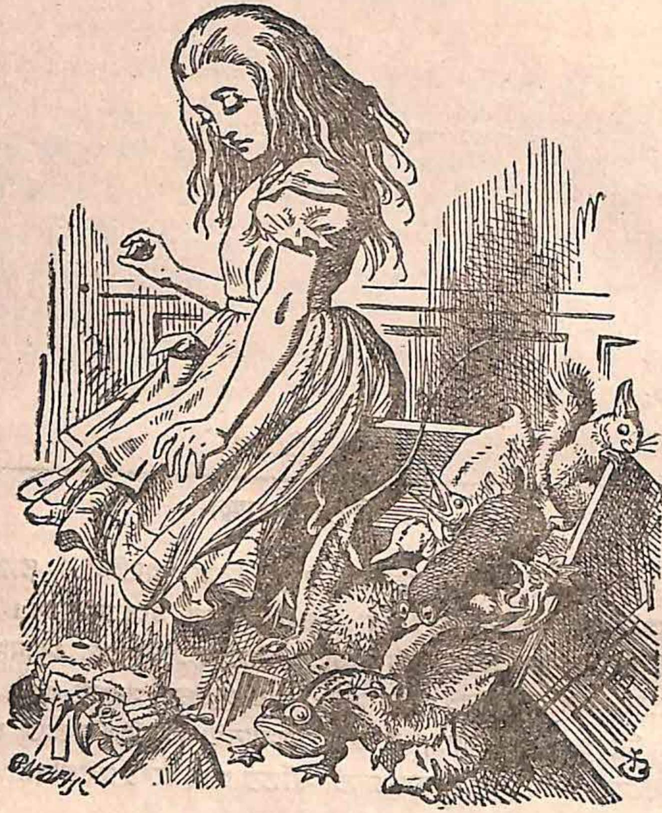
অ্যালিসের সাক্ষ্য

"এই যে!" বলে চেঁচিয়ে সাড়া দিলে অ্যালিস। তালেগোলে খেয়ালই রইল না যে, ইতিমধ্যে কতখানি বড়ো হয়ে গেছে সে। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তার ঘাগরার কোনায় লেগে জুরিদের খুপ্‌রিটা উল্টে পড়ে গেল, আর জুরিরা সব্বাই ঘাড় গুঁজড়ে পড়ল নিচের ভিড়ের মধ্যে, তারপর সেখানেই কিলবিল করতে লাগল। হপ্তাখানেক আগে লাল-মাছের একটা কাঁচের জার উল্টে ফেলেছিল অ্যালিস —ঠিক সেই মাছেদের মতো দশা।

অ্যালিস সন্ত্রস্ত হয়ে বললে, "ছি, ছি! খুব অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ বরবেন!" বলে তাড়াতাড়ি তাদের মাটি থেকে তুলতে লাগল, কারণ সেই লাল-মাছের ঘটনার পর থেকে ওর কেমন একটা ধারণা হয়েছে যে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের তুলে আবার খুপ্‌রিতে পুরে না-দিলে, ওরা বাঁচবে না।

রাজামশাই খুব গম্ভীর গলায় বললেন, "জুরিরা যথাস্থানে ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত বিচারের কাজ চলা সম্ভব নয়—সমস্ত জুরিরা!!" শেষের কথাদুটো বিশেষ জোর দিয়ে বললেন তিনি, কঠিন চোখে অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে।

জুরি-বক্সের দিকে তাকিয়ে অ্যালিস দেখতে পেলে যে, তাড়াতাড়িতে



সে টিকটিকিটাকে উল্টোবাগে বসিয়ে ফেলেছে, আর, সে বেচারা নড়াচড়া করতে পারছে না বলে অত্যন্ত করুণভাবে ল্যাজ নাড়াচ্ছে। অ্যালিস সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে ঠিক করে বসালে। মনে মনে ভাবলে, 'বিশেষ কিছু আসে-যায় না অবশ্য। সোজাই হোক, আর উল্টোই হোক, বিচারের কী কাজেই-বা লাগছে ওরা!'

আচম্‌কা উল্টে পড়ে যাওয়ার ফলে জুরিরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল; সেটা কেটে যাবার পর তাদের শ্লেট আর পেনসিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে যার-যার হাতে ফেরত দিতেই, তার অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে পুরো ঘটনাটার একটা বিবরণ লিখে ফেলতে আরম্ভ করে দিলে! কেবল টিকটিকিটা পারলে না; তখনো সে কেমন-ধারা হয়ে রয়েছে, হাঁ করে আদালতের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

রাজা অ্যালিসকে জিগেস করলেন, "এ-ব্যাপারে কী জান তুমি?"

অ্যালিস বললে, "কিচ্ছু না।"

রাজা আবার বললেন, "একেবারে কিছুই না?"

অ্যালিস বললে, "একেবারে কিছুই না।"

জুরিদের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, "এটা খুব দরকারি কথা।" জুরিরা কথাটা শ্লেটে টুকে নিতে যাচ্ছে, এমন সময়ে সাদা খরগোশ বাধা দিয়ে বললে, "মহারাজ নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছেন—অ-দরকারি কথা।" বেশ সম্ভ্রমের গলায় বললে অবশ্য, কিন্তু বলবার সময়ে রাজার দিকে ভুরু নাচিয়ে মুখ ভ্যাঙচালে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, অ-দরকারি-ই তো বলতে চেয়েছিলাম আমি।" তারপর বিড়্‌বিড়্ করে বলতে লাগলেন, "দরকারি—অদরকারি—দরকারি—অদরকারি—দরকারি—অদরকারি," যেন দেখতে চান, কোন কথাটা শুনতে ভালো।

কোনো জুরি লিখে নিলে 'দরকারি', কোনো জুরি লিখলে 'অদরকারি'। অ্যালিস সেটা দেখতে পেলে, কারণ ও কাছেই ছিল। মনে মনে ভাবলে, 'কীই-বা আসে-যায়!'

রাজা এতক্ষণ খুব ব্যস্ত হয়ে তাঁর নোটবইয়ে খস্‌খস্ করে কী সব লিখছিলেন, এখন হাঁকলেন "চুপ কর সব!" তারপর নোটবই থেকে পড়ে শোনালেন, "বিয়াল্লিশ নম্বর কানুন—এক মাইলের চেয়ে বেশি লম্বা যারা, তারা আদালত থেকে বেরিয়ে যাবে।"

সবাইয়ের চোখ পড়ল অ্যালিসের দিকে।

অ্যালিস বললে, "আমি এক মাইল লম্বা নই।"

রাজা বললেন, "হ্যাঁ, এক মাইল লম্বা।"

রানী ফোড়ন কাটলেন, "দু মাইলের কাছাকাছি।"

অ্যালিস বললে, 'মোট কথা, আমি এখান থেকে নড়ছি না। তা ছাড়া, ওটা মোটেই কোনো সাধারণ নিয়ম নয়, আপনি এক্ষুনি এক্ষুনি বানালেন।"

রাজা বললেন, 'কেতাবের সবচেয়ে পুরনো নিয়ম এটা।"

অ্যালিস বললে, "তা হলে তো এক নম্বর কানুন হত।"

রাজামশাই ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে তাড়াতাড়ি নোটবই বন্ধ করে দিলেন। তারপর কাঁপা কাঁপা মৃদু গলায় জুরিদের বললেন, "বিবেচনা করে রায় দিন।"

সাদা খরগোশটা ব্যাস্ত-সমস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠে বললে, "মাফ করবেন মহারাজ, আরো সব সাক্ষ্য-প্রমাণ বাকি রয়েছে। এই কাগজটা এইমাত্র পাওয়া গেল।"

রানী বললেন, "কী আছে ওতে ?"

সাদা খরগোশ বললে, "এখনো খুলে দেখিনি, তবে মনে হচ্ছে, এটা একটা চিঠি, বন্দী আসামী লিখেছে—কাকে যেন লিখেছে।"

রাজা বললেন, "তা তো হতেই হবে, কাউকে-না-কাউকে না-লিখলে তো নেই-লোককে চিঠি লিখতে হয় ; সেটা সচরাচর হয় না, জান তো।"

একজন জুরি জিগেস করলে, "কাকে পাঠানো হয়েছে ?"

সাদা খরগোশ বললে, "কাউকেই পাঠান হয় নি। আসলে বাইরের দিকে কিছু লেখাই নেই।" তারপর কাগজের ভাঁজ খুলে বললে, "আসলে এটা চিঠিই নয়, ছড়া।"

আর একজন জুরি প্রশ্ন করলে, "হাতের লেখাটা কি বন্দীর ?"

সাদা খরগোশ বললে, "না, তা নয়। আর সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার।" (জুরিরা সবাই ধাঁধায় পড়ে গেল।)

রাজা বললেন, "নিশ্চয় ও অন্য কারও হাতের লেখা নকল করেছে।" (জুরিরা সব আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল।)

গোলাম বললে, "দয়া করুন মহারাজ। ওটা আমার লেখা নয়, ওরা প্রমাণ করতেও পারবে না যে, আমি লিখেছি ; তলায় তো কোনো নাম সই করা নেই।"

রাজা বললেন, "যদি সই না করে থাকো, তা হলে ব্যাপারটা আরো গুরুতর হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব ছিল তোমার মাথায়, তা না হলে সৎ লোকের মতো নাম সই করতে।"

এই কথায় চারিদিকে হাততালির ধুম পড়ে গেল ; সারাদিনে এই প্রথম একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বেরিয়েছে মহারাজের মুখ থেকে।

রানী বললেন, "এতেই ওর অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে।"

অ্যালিস বললে, "এতে কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না। কাগজে কী লেখা আছে, তাই-ই জানেন না আপনারা।"

রাজা বললেন, "ছড়াগুলো পড়ে শোনাও।"

সাদা খরগোশ নাকে চশমা এঁটে নিয়ে বললে, "আজ্ঞে, কোন জায়গা থেকে আরম্ভ করব, মহারাজ ?"

রাজা গম্ভীরভাবে বললেন, "শুরু থেকে আরম্ভ করে, শেষ অবধি পড়, তারপর থাম।"

সাদা খরগোশ পড়লে ঃ

"তারা বলে তুই নাকি গিয়েছিলি তাঁর কাছে
আমার বিষয়ে বাতলাতে
বলেছিলি মোর না-কি আর সব গুণ আছে,
কেবল পারি না সাঁতরাতে
সে তাদের বলেছিল, আমি সেথা যাই নাই
(জানি মোরা, ভুল নেই তায়)
অল্পেতে তিনি যদি রেহাই না-দেন, ভাই,
তোর কী যে দশা হবে, হায় !

"দিনু তাঁরে একখানি তারা তাকে দিল দুটি,
তিন দিলি আমাদের ভাগে।
তার কাছ থেকে সব তোর কাছে গেল জ টি
যদিও আমার ছিল আগে।
আমি আর তিনি যদি, পোড়া কপালের দোষে,
এ-ব্যাপারে কভু পড়ি জড়িয়ে
আমাদের মতো সবে ছেড়ে দিতে বলত সে
তোর ওপর বিশ্বাস করিয়ে।

"আমার ধারণা ছিল বরাবর মনেপ্রাণে
(তখনো হননি তিনি রেগে খুন)
সে এবং আমরাও ইহাটির মাঝখানে
বাধা দিতে তুই অতি সুনিপুণ।
সে যেন শোনে না, তাঁর লেগেছে চমৎকার !
গোপনে হয়েছে এটা সারা।
এ কথা জানে না, যেন ওরা, তারা, কেহ আর
শুধু এক তুই, আমি ছাড়া।"

রাজা হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, "এখনো পর্যন্ত যে-সব

সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনা গেল, এটাই তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই জুরিমহোদয়গণ এবার—"

অ্যালিস বললে, (ইতিমধ্যে সে এত বড়ো হয়ে গেছে যে, স্বয়ং রাজার কাজেও বাধা দিতে পেছ-পা নয়), "জুরিদের একজনও কেউ যদি ছড়াটার মানে বলতে পারে, আমি তাকে পয়সা দেব।"

জুরিরা সবাই নিজের নিজের শ্লেটে লিখে ফেললে, "এর মধ্যে এক কণাও অর্থ আছে বলে মেয়েটা মনে করে না ;" কিন্তু কেউই তার মানে বার করবার চেষ্টা করলে না।

রাজা বললেন, "মানে যদি না-ই থাকে, তা হলে আমাদের অনেক খাটুনি বেঁচে গেল, বুঝলে কি-না, কারণ, তা হলে মানে বার করবার চেষ্টা না করলেও চলবে।" তারপর ছড়া লেখা কাগজটা কোলের ওপর বিছিয়ে একটা চোখ সেইদিকে রেখে আবার বললেন, "কিন্তু, তবু ঠিক বলা যাচ্ছে না। একটা অর্থ যেন পাচ্ছি পাচ্ছি মনে হচ্ছে আমার। '—কেবল পারি না সাঁতরাতে—' তুমি সাঁতার কাটতে পার না তো ?" শেষ কথাটা বললেন গোলামের দিকে ফিরে।

গোলাম বেশ দুঃখের সঙ্গেই মাথা নাড়লে। বললে, "আমায় দেখে কি তাই মনে হয় হুজুর ?" (মনে তো হয়ই না, শক্ত কাগজ দিয়ে তো তৈরি।)

"বেশ, এপর্যন্ত ঠিক আছে।" বলে রাজামশাই ছড়াগুলো বিড়্‌বিড়্‌ করে আওড়াতে আওড়াতে মন্তব্য করতে লাগলেন "—'জানি মোরা, ভুল নেই তায়—' তার মানে নিশ্চয়ই জুরিরা ; '—দিনু তাঁরে একখানি, তারা তাকে দিল দুটি—' আরে, এত বেশ বোঝাই যাচ্ছে যে, পেরাকি নিয়ে সে এই কাণ্ডই করেছে—"

অ্যালিস বললে, "কিন্তু তার পরেই যে রয়েছে '—তার কাছ থেকে সব তোর কাছে গেল জুটি—'।"

টেবিলের ওপরে পেরাকির থালার দিকে দেখিয়ে রাজা বিজয়গর্বে বলে উঠলেন, "ঐ তো, সামনেই তো রয়েছে ! এর চেয়ে জলের মতো সোজা আর কী হতে পারে। তারপর এই যে '—তখনো হননি তিনি রেগে খুন—' হ্যাঁগা, তুমি কখনো খুন হয়েছ বলে তো আমার মনে পড়ে না ?" শেষের কথাটা রানীকে বলা হল।

রানী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, "কখ্‌খনো না।" বলার

সঙ্গে সঙ্গে টিকটিকির দিকে তাগ করে একটা কালির দোয়াত ছুঁড়ে মারলেন। (বেচারি বিল্ আঙুল দিয়ে লেখা যাচ্ছে না দেখে লেখার চেষ্টা না করে চুপচাপ বসেছিল এতক্ষণ; এখন ঝট্ করে আবার লেখায় হাত দিলে—মুখচোখ বেয়ে কালি গড়াচ্ছিল, সেই কালি দিয়েই কাজ সারতে লাগল, যতক্ষণ পারলে।)

রাজা বললেন, "তা হলে এই-সব কথা তোমার গুণের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।" বলে মুচকি হেসে আদালতের চারিদিকে তাকালেন। টুঁ শব্দটি শোনা গেল না।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে রাজা বললেন, " 'খুন' আর 'গুণ' কেমন মিল করলুম!" এবার সব্বাই হেসে উঠল।



রাজা বললেন, "জুরি-মহোদয়গণ এবার বিবেচনা করে রায় দিন।" এই নিয়ে বার কুড়ি বলা হল।

রানী বললেন, "না, না! আগে দণ্ড, তারপর রায়।"

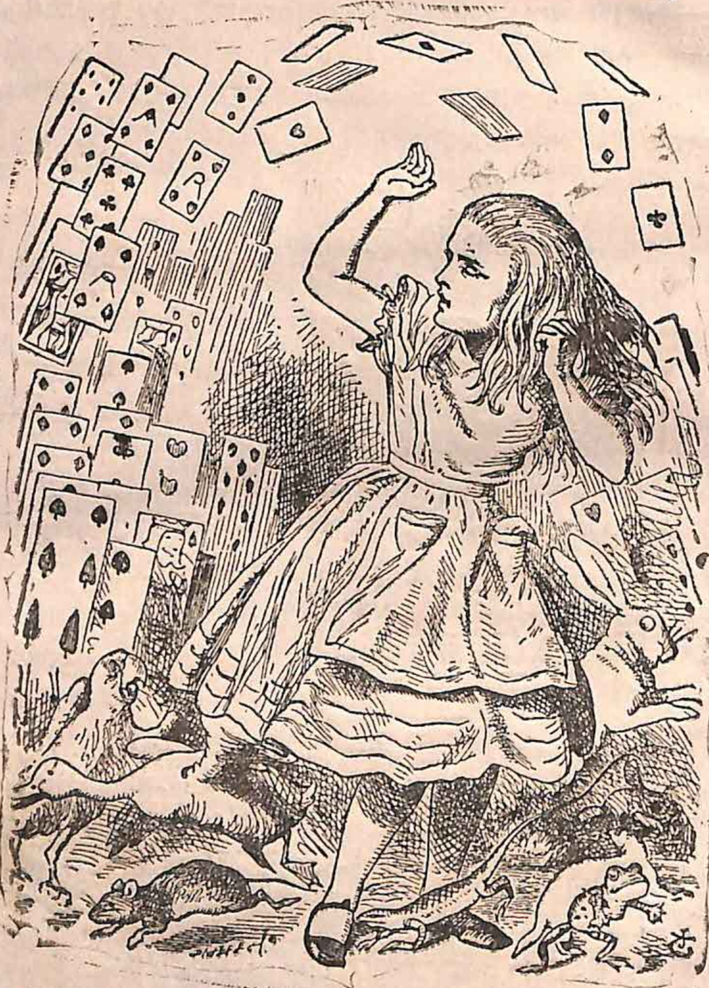
অ্যালিস চেঁচিয়ে বললে, "আগে দন্ড আবার কী? যত সব আবোল-তাবোল কান্ড, মাথামুণ্ডু কিছু নেই।"

রানী লাল হয়ে বললেন, "মুখ সামলে !"

অ্যালিস বললে, "বয়ে গেছে !"

রানী তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, "ওকে কোতল কর।" কেউ নড়ল না।

অ্যালিস বললে, (এতক্ষণে নিজের আসল চেহারার মাপের হয়ে গেছে সে), "ভারি তো এক গোছা তাস ! কে তোমাদের তোয়াক্কা করে ?"



এই কথা বলতেই সবকটা তাস শূন্যে উঠে অ্যালিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। খানিকটা ভয়ে আর খানিকটা রাগে একটা

তীক্ষ্ণ আওয়াজ বার হল তার গলা দিয়ে, হাত দিয়ে ওদের ঠেকাতে চেষ্টা করলে, আর সঙ্গে সঙ্গে টের পেলে—দিদির কোলে মাথা রেখে সেই মাঠের ওপর সে শুয়ে রয়েছে, গাছের ঝরা-পাতা উড়ে উড়ে এসে পড়েছে তার মুখে, দিদি আস্তে আস্তে সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছে।

দিদি বললে, 'অ্যালিসরানী, উঠে পড়! বাব্বা, কী ঘুম ঘুমোলে!"

অ্যালিস বললে, "ওঃ, কী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম, দিদি!" তার পর যতটা মনে এল, সব তার দিদিকে বললে—এতক্ষণ তোমরা যে-সব অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার কথা পড়লে, সেই-সব কথা; যখন বলা শেষ হল, তখন দিদি তাকে চুমো খেয়ে বললে, "সত্যিই খুব অদ্ভুত স্বপ্ন তো; এবার কিন্তু, ছুট্টে বাড়ি গিয়ে চা খেয়ে নাও, দেরি হয়ে গেছে।" কাজেই অ্যালিসকে বাড়ির দিকে ছুটতে হল, ছুটতে ছুটতে ভাবতে লাগল, কী চমৎকার স্বপ্নটা!

তার দিদি কিন্তু যেমনকার তেমনি বসে রইল সেখানে; হাতের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল তার ছোট্টো বোনটির কথা, তার স্বপ্নের অদ্ভুত ঘটনাগুলোর কথা। ভাবতে ভাবতে সেও একধরনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিলে—

প্রথমে দেখলে ছোট্টো অ্যালিসকে; তেমনি করে তার দিদির হাঁটুর ওপর কচিকচি হাত দুটো জড়ো করে রেখেছে, জ্বলজ্বলে বড়ো-বড়ো চোখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে; অ্যালিসের গলার মিষ্টি স্বরটুকু কানে এল তার, পরিষ্কার দেখতে পেলে, চোখের ওপর কেবল-কেবল চুল এসে পড়ছে বলে অ্যালিস ঠিক সেইরকম ছোট্টো করে অদ্ভুতভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে—অ্যালিসের কথা তখনো তার কানে আসছে—মনে হচ্ছে যেন কানে আসছে—সেই-সব কথা শুনতে শুনতে তার আশপাশের সমস্ত জায়গাটা ছোট্টো অ্যালিসের দেখা সেই-সব অদ্ভুত অদ্ভুত পশুপাখির জটলায় যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

সাদা খরগোশটা দৌড়ে চলে যেতেই পায়ের কাছের ঘাসগুলো খস্‌খস্ করে উঠল—পাশের পুকুরটায় আতঙ্কিত নেংটিইঁদুর ছপ্‌ছপ্ করে সাঁতার কাটতে লাগল—অন্তহীন চায়ের আসরে চৈতী খরগোশ আর তার স্যাঙাৎদের চায়ের পেয়ালার টুংটাং শব্দ কানে এল, কানে এল হতভাগ্য অতিথিদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে মহারানীর তীক্ষ্ণ

চৎকার—জমিদারগিন্নীর কোলে শুয়োর-বাচ্ছাটা আবার হাঁচতে শুরু করলে, তার চারিপাশে ঝন্‌ঝন্‌ করে বাসনপত্র পড়তে লাগল—গ্রাইফনের তারস্বর, টিকটিকির পেনসিলের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ, 'অবদমিত, গিনি-পিগদের দম বন্ধ হবার আওয়াজ, আর তার সঙ্গে চিরদুঃখী নকল কাছিমের দূর থেকে ভেসে-আসা ফোঁপানির শব্দ মিলে সেখানকার আকাশ-বাতাস যেন ভরপুর হয়ে উঠল।

দিদি চোখ বন্ধ রেখে বসেই রইল সেখানে, আধো বিশ্বাস নিয়ে থেকে গেল সেই আজব দেশে ; সে তো জানে যে, চোখের পাতাটুকু ফাঁক করলেই আবার ফিরে দেখা দেবে সেই একঘেয়ে পুরনো জগৎ—বাস্তব জগৎটা—দেখা যাবে, ঘাসগুলো নড়ছে বাতাসে, কাছের পুকুরটায় জলের শব্দ উঠছে নলখাগড়া দুলে উঠছে বলে—চায়ের পেয়ালার টুংটাং শব্দ হয়ে যাবে ভেড়ার গলার ঘণ্টার শব্দ, রানীর চিৎকার হয়ে যাবে রাখাল-ছেলের ডাক—আর, বাচ্ছার হাঁচি, গ্রাইফনের তারস্বর আর যত কিছু অদ্ভুত শব্দ এক হয়ে যাবে (সে জানে, হয়ে যাবে) পাশের খেত-খামারের কাজকর্ম, কথাবার্তার আওয়াজের সঙ্গে—নকল কাছিমের বুক-ফাটা গোমরানি একাকার হয়ে যাবে দূরের গোরু-বাছুরের হাম্বা ডাকের শব্দে।

এবার সে ভবিষ্যতের সেই সময়কার ছবি আঁকলে মনে মনে, তার ছোট্টো বোনটি কেমন গিন্নীবান্নি হয়ে উঠবে তখন, বড়ো হতে হতেও ছেলেবেলাকার তার এই মায়ায় ভরা সরল হৃদয়টিকে অম্লান রাখতে পারবে ; তখন সে কেমন ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের জড়ো করে আজব আজব গল্প শুনিয়ে তাদের চোখে বিস্ময়ের আলো ফুটিয়ে তুলবে, আগ্রহের ঝিলিক জ্বালিয়ে তুলবে, অনেক দিন আগেকার এই আজব দেশের স্বপ্নের কথাও বলবে হয়তো ; আর, বেশ কেমন তার নিজের ছেলেবেলার কথা, গ্রীষ্মের এই মধুর দিনগুলোর কথা তখনো তার মন থেকে মুছে যাবে না, আর তাই, সেই-সব খোকাখুকুদের সহজ-সরল দুঃখে তখনো তার বুক মুচড়ে উঠবে, তাদের সহজ-সরল আনন্দ তার মনে তুলবে খুশির ঢেউ।

*